অকাল বসন্ত

অকাল বসন্ত

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীশ্যামসুন্দর মজুমদার
৫০।৭ বি, হরিশ মুখার্জি রোড্
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৩৯
দাম দুই টাকা

"অবসর প্রেস"
প্রিণ্টার—শ্রীমহেশ চন্দ্র পাত্র
৩৪ নং কালী দত্তের ষ্ট্রীট
কলিকাতা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

বন্ধুবরেষু

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মেয়েদের হস্‌টেলে ঘরে-বারান্দায় তুমুল হট্টগোল সুরু হয়েছে। দীপ্তি খবরটা এতোক্ষণ লুকিয়েছিলো, সদলবলে বায়স্কোপ থেকে ফিরে কাপড় ছাড়বার সময় ব্লাউজের তলা থেকে চিঠিটা বের করে' সে সুষমার হাতে দিলে।

আর যায় কোথা! তাই মেয়ের আজ এত ফুর্তি! তাই সবাইকে সে আজ নিজের পয়সায় বায়স্কোপ দেখালে।

দীপ্তিকে সবাই ছেঁকে ধরলো। কারুর কাঁধের থেকে আঁচল তখন বাহুর ওপর আল্‌গা হ'য়ে ঝল্‌মল্‌ করছে, এলানো চুলের মধ্যে মোটা-দাঁড়া রঙিন চিরুনি চালিয়ে দাঁতে ফিতে কামড়ে কেউ এসে হাজির, তাড়াতাড়িতে স্যাণ্ডেলের ষ্ট্র্যাপটা কেউ ঠিকমতো বসাতে পারে নি।

চিঠিটা শূন্যে নাড়তে-নাড়তে সুষমা খবরটা চারদিকে রাষ্ট্র করে' দিলো।

—ওমা, মেয়েটা ডুবে-ডুবে এতো জলও খেতে পারে!

—তাই ক'দিন থেকে এমনি উড়ু-উড়ু, সাড়িগুলো রোদে পেড়ে নতুন করে' শুকোতে দেওয়া হচ্ছে।

—বিকেল-বিকেল মেয়ের আর দেখা পাওয়া যায় না। বেণীতে ফাৎনা ঝুলিয়ে চলেছেন তিনি কালীঘাটে মামার বাড়িতে।

—মামাবাড়ি না হাতি! কালীর মন্দিরে হত্যে দিতে! পেটে তোর এত বুদ্ধিও ছিলো, দীপ্তি।

—ত্থাখ্‌, ওর দিকে চেয়ে ত্থাখ্‌ একবার। খুসিতে একেবারে ফেটে পড়েছে। আনন্দে ওকে ম্যালেরিয়ায় ধরলো বুঝি।

—অতো অংখার কিসের লো ছুঁড়ি! আমাদেরো এক দিন হ'বে।

—খুসিতে আমরাও একদিন অমনি হি-হি করে' কাঁপবো। বোকা একটু আমাদেরো হ'তে হ'বে।

অনেক হাসি ও কোলাহল, অনেক ক্ষিপ্র পদশব্দ।

সুষমা চারদিকে চোখ ফিরিয়ে বল্‌লে,—শান্তি, শান্তি কোথায়? খবরটা ওর কাছেই বা চাপা থাকে কেন?

দক্ষিণে বারান্দাটা যেখানে বাথ্‌-রুমের দিকে ঘুরে গেছে তারই পাশে শান্তির ঘর। দরজায় মোটা খদ্দরে নীল রঙ-করা পরদা ঝুল্‌ছে।

হুড়মুড় করে' মেয়ের দল এবার সেই ঘর আক্রমণ করলে।

হস্‌টেলের মধ্যে এই ঘরটিই সব চেয়ে ছোট, নিরিবিলি—একজনের থাক্‌বার মতো। এই ঘরের ওপর শান্তির দাবির কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী জোটে নি। এই ঘরেই তাকে বেশি মানায়, কেননা সব চেয়ে সে কম কথা কয়, সবার থেকে নিজেকে সে আড়াল করে' রাখে। নিজের উপস্থিতিটা অনুচ্চারিত রাখতে পারলেই সে খুসি হয়। কিন্তু এমন রোমহর্ষক খবরটার কিছু ভাগ তাকে না দিলে তাকে নিয়ে হস্‌টেলে একসঙ্গে থাকার কোনোই মানে হয় না।

সিলিঙ থেকে ইলেট্রিক্ আলোর বাল্‌ব্‌টা ঝুল্‌ছে, তারই দিকে পিঠ করে' শান্তি লোহার চেয়ারে বসে' সামনের টেব্‌লের ওপর এক-রাজ্যের বই-খাতা ছড়িয়ে পড়ায় মগ্ন হ'য়ে আছে।

টেব্‌লের ওপর গোল একটু ছায়া পড়েছে, পাশের বাড়ির একটা ঘর উদ্ধত চোখে এই দিকে তাকায় বলে' দক্ষিণের জান্‌লাটা বন্ধ। ছোট ঘরটি ঘিরে কঠিন স্তব্ধতা।

এতো গোলমালেও কেউ কুঁজো হ'য়ে বসে' পড়া করে' যেতে পারে—মেয়ের দল রীতিমতো খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌লো।

ছোঁ মেরে শান্তির চোখের সাম্‌নে থেকে বোটানির নোট্‌টা কেড়ে নিয়ে সুষমা বল্‌লে,—হয়েছে লো হয়েছে, বিদ্যের জাহাজ হ'লেই আর সংসার-সমুদ্রে ভেসে পড়তে পারবি নে। এদিকে ব্যাপার কী, জানিস্‌?

চেয়ার থেকে না উঠে, মাত্র ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে শান্তি সস্মিতমুখে বল্‌লে,—কী?

—আর কী! সুষমা দীপ্তির এক গোছা চুল মুঠো করে' চেপে ধরে' সাম্‌নের দিকে তাকে টান্‌তে-টান্‌তে বল্‌লে,—এই পোড়ামুখির কীর্তি। আস্‌চে পঁচিশে তারিখে ওর বিয়ে।

—বিয়ে? চেয়ার নিয়ে শান্তি এবার ঘুরে বস্‌লো। তাই তোদের এতো ফুর্তি! কান্নাকাটি না করে' দিব্যি মাতামাতি সুরু করেছিস্‌?

—কাঁদতে যাবে কোন্‌ দুঃখে? শতদল বল্‌লে: এ তো আর কাঠগড়ায় গলা পেতে বলি হওয়া নয়, দস্তুরমতো লাভ্‌-মেরেইজ্‌। বাবা ওর মত দিয়ে চিঠি লিখেছেন।

প্রতিভা বল্‌লে,—ও তার কী করে' বুঝবে বল্‌? ও তো আগাগোড়া একটি কাঠ—মূর্তিমান য়্যান্টি-সেপ্‌টিক্‌।

শান্তি ঠোঁট কুঁচ্কে নীরবে একটু হাস্লো।

সুষমা খাতাটা শান্তির কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে,—নে, বাবা, পড়্ বসে' বসে'। ডজন-খানেক লেটার্ পেয়ে ডিগ্বাজি খেয়ে গেজেটের মাথায় গিয়ে ওঠ্। আমরা ভাই এখন থেকেই জোলাপ্ নিতে সুরু করি।

সুনন্দা বল্লে,—দীপ্তির বিয়েতে আমরা ভাই নিয়ম উলটে দেব। মিছিল করে' মেয়ে যাবে বিয়ে করতে, সঙ্গে আমরা যাবো বধূযাত্রিনীর দল। বলে'ই তার অনর্গল হাসি।

এক-এক করে' আস্তে-আস্তে সবাই সরে' পড়তে লাগ্লো। যাবার আগে সুষমা বল্লে,—মুখ গোম্‌রা করে' যতোই কেন পড়ো না বাপু, শেষকালে একদিন গাঁটছড়া বেঁধে এমনি সরে' পড়তে হ'বে। কোথায় বা তখন তোমার মেকলের ষ্টাইল্, কোথায় বা তোমার ইকলজি!

ঘরটি আবার ছোট হ'য়ে এলো। শান্তি টেব্‌লের ওপর ঝুঁকে পড়ে' আবার পড়ায় মন দিলে। দুই চক্ষু দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ করে' বইয়ের অক্ষরগুলিকে সে স্পষ্ট, পরস্পর-সংলগ্ন ও অর্থবান্ করে' ধরে' রাখবার চেষ্টা করতে লাগলো; কিন্তু তার মন কখন বিমুখ হ'য়ে উঠেছে।

বই-খাতা তেমনি ছড়িয়ে রেখে চেয়ারে পিঠ দিয়ে সে চুপ করে' একমনে মেঝের দিকে চেয়ে রইলো।

একপাশে নিচু একখানি তক্তপোষ পাতা, সেল্ফ্-এর অভাবে তারই শিয়রের দিকে এক তা খবরের কাগজ বিছিয়ে শান্তি তার

ওপর থরে-থরে তার বই সাজিয়ে রেখেছে—প্রত্যেকটি বইয়ে পুরু করে' মলাট দেওয়া। অনেক বই—কেরোসিন-কাঠের ছোট টেব্‌লে কুলিয়ে ওঠে না। বইর ওপর তার ভীষণ যত্ন; ময়লা-সাড়িতে নিজে সে দু' সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু মলাটের ওপর একটি কালির আঁচড় সে সইতে পারে না। সামান্য একটা দাগ পড়লে বা কোণ দিয়ে একটু ছিঁড়ে গেলে তক্ষুনি সে-মলাট বদ্‌লে ফেলা চাই। যা-তা কাগজে মলাট দিলে চল্‌বে না—মলাটের জন্যে সে আর-আর মেয়ের ঘরে কাগজ খুঁজে বেড়ায়—ডাইং-ক্লিনিংএর দোকান থেকে যদি কারুর কাপড়-ব্লাউজ ব্রাউন্‌-পেপারের প্যাকেটে কোথাও এসে থাকে। ব্রাউন্‌-পেপার না হ'লে অন্তত ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌এর ছবির পৃষ্ঠাটা। তা না জুট্‌লে মাসান্তে দেয়াল-জোড়া ক্যালেণ্ডারের রঙচঙে দু' একটা ছেঁড়া পাতা। নিজের না জুট্‌লেও বইগুলিকে তার এমনি জ্যাকেটে সাজিয়ে রাখা চাই। ওদের পৃষ্ঠার ধারে-ধারে হিজিবিজি নোট টুকতে পর্য্যন্ত তার মায়া করে।

এ-ছাড়া আর তার কোনো আসবাব নেই। তক্তপোষের নিচে ছোট একটা টিনের ট্রাঙ্ক—মা'র অধিবাসের সময় পাওয়া—বাবার সঙ্গে অনেক দূর দেশ অতিক্রম করবার অভিজ্ঞতা তার সর্ব্বাঙ্গে মুদ্রিত হ'য়ে আছে। এই ট্রাঙ্কটিই মা তাকে দিয়ে দিয়েছেন। বাড়িতে বেতের দু'য়েকটা যে বাক্স আছে তাতেই ওঁদের চলে' যাবে। রাত হ'য়ে এলে পাশের বাড়ির কোলাহল যখন থেমে যায়, তখন দক্ষিণের জান্‌লাটা সে খুলে দেয়। দেয়ালের

বাধা ডিঙিয়ে কোথা থেকে ফুর্‌ফুরে একটু হাওয়া আসে—সারা দিনের শান্তির পর ঠিক মা'র ঝিমিয়ে-পড়া ক্লান্ত স্বরের ঘুম-পাড়ানি ছড়া-কাটার মতো—তার মশারির দরকার হয় না। যেদিন রাত জেগে পড়বার খুব ইচ্ছে হয়, প্রতিভার ঘর থেকে চীনে-ধূপের দু'-একটা 'কয়েল্‌' সে চেয়ে আনে। শীত এসে পড়লে আর তো ভাবনাই নেই, মাথা পর্য্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়ে আগাগোড়া নিটোল একটি ঘুম। তা, শীত এই এসে গেলো আর কি।

ভারি তো দুয়েকখানা সাড়ি—তার জন্যে ব্র্যাকেট চাই না হাতি! দুটো দেয়াল যেখানে এসে মিশেছে তারই দু' পারে দুটো পেরেক পুঁতে একটা দড়ি সে টাঙিয়ে নিয়েছে—তারই ওপর সাড়ি-সেমিজ-পেটিকোটগুলি ঝুল্‌ছে। একখানি আয়না পর্য্যন্ত নেই, না একটা চিরুনি,—যে কোনো ঘরে গেলেই সে নির্ব্বিবাদে চুল বাধা সেরে আস্‌তে পারে। যা একখানা মুখ, তার জন্যে আবার স্নো-পাউডার চাই, না, আর কিছু। সেলুলয়েডের কয়েকটা কাঁটা, আর একটা কেলে-কুষ্টি তেল-কুচকুচে ফিতে। মা নেহাৎ রোজ সন্ধ্যায় চুল বাধতে বলে' দিয়েছেন বলে'ই শান্তি এই একটু যা প্রসাধন করে, চুল আঁচড়াবার সময় তার মা'র কথা, খেলা ছেড়ে ছোট ভাই দু'টির বাড়ি-ফেরার কথা, গ্রামের সন্ধ্যার কথা, দীপান্বিত পরিচ্ছন্ন তুলসী-তলাটির কথা মনে হয়।

হ্যাঁ, টেব্‌লের ওপর এক বাণ্ডিল মোমবাতি—কয়েকটা তার খরচ হয়েছে বটে। এগারোটার পর আলো জ্বাল্‌বার নিয়ম নেই—দরোয়ান মেইন্‌ সুইচ্‌ বন্ধ করে' দেয়। তখন এই মোমবাতির

স্নিগ্ধ আলোয়—পড়ায় যখন আর মন বসে না—শান্তি মা'র কাছে চিঠি লেখে। শুধু মা'র কাছে লিখেই তার নিস্তার নেই, ছোট ভাই দু'টিকেও লিখ্‌তে হয়—তাদের কারুর প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব করলে চলবে না। দস্তুরমতো তারা পৃষ্ঠা মেপে ও লাইন্‌ মিলিয়ে নেয়,—এবং কোন্‌ মূল্যবান খবরটা কাকে জানানো উচিত ছিলো এই নিয়ে দিদির কাছে অভিযোগের তাদের অন্ত থাকে না। খবর দেবার মৌলিকতায় দিদিকেও তারা ছাড়িয়ে গেছে। গ্রামের ঝাকুরকাটির জঙ্গলে কোথায় একটা বাঘ এসেছে বলে' শোনা যাচ্ছে—দিদিকে চিঠিতে সেই খবর দিতে গিয়ে দুই ভাই কালি-কলমের সাহায্যে প্রকাণ্ড দুটো বাঘ এঁকে বসে। সেই দুটো গোলাকার-চক্ষু বিস্ফারিত-দন্ত নামহীন জন্তুর দিকে চেয়ে কাকে যে সে প্রতিযোগিতায় জয়ী করবে শান্তি কিছুতেই তা ভেবে ঠিক করতে পারে না।

আর, দেয়ালের এক কোণে একটা ছাতি—অতোটা পথ সে খালি মাথায় হাট্‌তে পারে না; একটা রিক্সা করে' গেলে হয় বটে, কিন্তু অতো তার পয়সা কোথায়? তারপর বিকেলে আবার টিউ-সানি আছে, বলা-কওয়া নেই ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করে' নেমে এলেই হ'লো!

টেব্‌লের সামনে চেয়ার টেনে এনে শান্তি আবার পড়ায় মন দিলে। কুড়েমি করবার তার সময় নেই। সামনেই একটা পরীক্ষা আছে—কিছুই তৈরি হয় নি। আর, এখন না পড়লে তার সময় কই? রাত জেগে আজ একটু পড়বে বলে' বেলাবেলিতেই সে রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছে।

কিন্তু বল্‌তে কি, পড়ায় সে কিছুতেই মন বসাতে পারলো না।

সহরের হট-কাঠ পাথর-লোহা ডিঙিয়ে মন তার কখন তাদের গ্রামের আকাশে পাখা মেলেছে। এখন গ্রাম একেবারে নিঝুম, কবির অলিখিত পৃষ্ঠাটির মতো নিঃশব্দ। রান্নাবান্না চুকিয়ে মা এতোক্ষণে ঘরে গিয়ে পাখা-হাতে বসে' মশা তাড়াচ্ছেন আর দের্‌খোতে মাটির বাতি জ্বালিয়ে মোহন গুনগুন করে' পড়া করছে। এই সবে তার থার্ড-ক্লাস্‌! টপাটপ্‌ বেরিয়ে পড়া চাই—এক বছরো তার সবুর করা চল্‌বে না। ভোর-রাতে উঠে মা আবার তাকে জাগিয়ে দেবেন। মিণ্টুরই মজা—অতো না পড়ে'ও সে ফার্ষ্ট হ'য়ে ফিফ্‌থ্‌-ক্লাসে উঠেছে। তার জন্যে দিদির ভাবনা নেই, ম্যাট্রিকে সে তাকে মাস-মাস অত্যন্ত পনেরো টাকার বৃত্তি এনে দেবে ঠিক।

নিজের ওপর বিরক্ত হ'য়ে শান্তি এবার গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগলো। একটা কিছু মুখস্ত করবার কসরৎ না করলে মন তার সায়েস্তা হচ্ছে না।

মেয়ের দল খেতে নিচে চলে' গেছে। আঁচিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠ্‌তে-উঠ্‌তেও তাদের সেই কথা: যাই বলো, দীপ্তি খাসা শিকার বাগিয়েছে—বিলেত থেকে ফিরে এসেও কি না সে এই জীবন্ত পুতুলটাই চেয়ে বস্‌লো। বলিহারি ভাই প্রেম, অতো দূরে গিয়েও মানুষে মনে করে' রাখতে পারে। এতোও পোষায়! আর, বাপই বা মত দেবেন না কেন শুনি? অমন একটি চৌকস

চাকরি যখন জোটাতে পেরেছে, তখন স্বয়ং উনিই প্রেমে পড়ে যেতে পারেন—মেয়ে তো কোন্ ছার !

হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনে শান্তি চম্‌কে উঠ্‌লো। দীপ্তি এসেছে। সারা শরীরে খুসি আর সে বইতে পারছে না।

শান্তি সামনের দিকে ডান-হাতটা সামান্য একটু বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে,—এসো। বিয়ের নামে মাটিতে যে আর পা পড়ছে না।

আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দীপ্তি তপ্তপোষের উপর বস্‌লো; বল্‌লে,—একেবারে উড়ে চলেছি, না? তা, বিয়ের নাম শুনে নয়, পাত্রের নাম শুনে। বিলেত যাবার আগে বাবার কাছে সে নেহাৎই ছিলো একটা চাষা, আস্‌তে-না-আস্‌তেই পুনায় একটা এগ্রিকাল্‌চারেল্ কলেজে চাকরি পেয়ে প্রায় সে এখন প্রিন্স্-অফ্-ওয়েল্‌স্। রাজকুমারী তো বটেই, বাবা দস্তুরমতো এখন পণ দিতে রাজি আছেন।

শান্তি নীরবে একটু হেসে বইর পৃষ্ঠা ওল্‌টাতে লাগ্‌লো।

এতোতেও তার একটু সাড়া নেই, শরীরের রেখাগুলি এতোতেও সে একটু কোমল করে' আন্‌লো না। দীপ্তি রীতিমতো অস্থির হ'য়ে শান্তির কোলের থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে,—কী কেবল রাত-দিন পড়ো?

শান্তি বল্‌লে,—কই আর পড়ি। এই রাতেই যা একটু সময় পাই। সকালে কলেজ, তুপুরে ইস্কুল-মাষ্টারি, বিকেলে আবার টিউসানি। রাত ছাড়া আর পড়বো কখন? তাও,

এতো খেটে আসবার পর এক-একদিন এমন ঘুম পায় যে খেয়ে-দেয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর মাথাটা তো একরকম সব সময়েই ধরে' থাকে।

দীপ্তি পা দোলাতে-দোলাতে বল্‌লে,—অতো পড়ে' কী হ'বে? আমার তো বাপু এইখেনেই খতম্‌। চেয়ারখানা কী করেছ আয়নায় একবার দেখ তো গিয়ে।

অল্প একটু হেসে শান্তি বল্‌লে,—আমি চেহারা দিয়ে কী করবো? আমি তো আর পাত্র জোটাবার জন্যে পড়ছি না।

—তবে কিসের জন্যে পড়ছ? মেয়েরা তবে কিসের জন্যে পড়ে?

—আমার ছোট ভাই দু'টিকে মানুষ করতে হ'বে। আমি ছাড়া মাথার ওপরে তাদের কেউ নেই। গেলো বছর হঠাৎ বাবা মারা গেলেন বলে'—

দীপ্তি বল্‌লে,—তোমার বাবা কিছু রেখে যান নি?

—কিছু ঋণ রেখে গেছেন। সব আমার কাঁধে। কর্পোরেসান্‌এর ইস্কুলে টিচার করে' মোটে পঁয়ত্রিশটি টাকা পাই, আর টিউশানিতে কুড়ি। আর, হস্‌টেলের খরচ রেখে বাড়িতে যা পাঠাই তা দিয়ে সুদের টাকা শোধ করে' মা আর ছোট ভাই দু'টির কিছুতেই চলে না। তবু আমি যতোদূর পারি, কম করে' চালাই। তা, এই অল্প টাকায় কি করে' কী হ'বে বলো?

—তারপর কী করবে?

—কী আবার করবো! অন্তত বি-এটা তো এমনি করে' পাস্ করি। চাকরিতে তা হ'লে একটা লিফ্‌ট্ পাবো মনে হয়। বি-এর সময় প্রাইভেটে পড়বো ভাবছি, তা হ'লে সময় করে' আরো এক-আধটা টিউসানি জোগাড় করতে পারবো। ওদিকে ভাইয়েদেরো তখন খরচ বাড়বে।

—তারপর ?

শান্তি দূর ভবিষ্যতের দিকে অন্ধ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো, কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। অসহায়ের মতো হেসে উঠে বল্‌লে,—তারপর আর জানি না। ভাইয়েরা একটা কিছু সুবিধে করে' নিতে পারলে ট্রেইনিঙেও চলে' যেতে পারি, ঠিক নেই। তখনকার কথা তখন। অতো দূরের কথা এখনো ভাবতে পারি না।

দীপ্তি হেসে বল্‌লে,—মাত্র এইটুকু তোমার ambition ?

—ভাইয়েদের মানুষ করতে চাই, বলতে গেলে এর চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জীবনে সম্প্রতি আমার আর কিছু নেই। আমার ছেলে হ'য়ে জন্মানোই উচিত ছিলো—তা হ'লে আরো কতো কাজ করতে পারতাম। মেয়েদের পদে-পদে কতো বাধা, কতো দারিদ্র্য।

—আর কতো প্রলোভনও।

—হ্যাঁ, প্রলোভনও কম নয়। তা আমি কোনোদিন আমোলে আনিনি, দীপ্তি। ভাই দু'টিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার নিদারুণ লোভই আমাকে পেয়ে বসেছে।

একটা বালিস কোলের ওপর কনুইয়ের তলায় দুম্‌ড়ে নিয়ে দীপ্তি বল্‌লে,—কোনোদিন তবে বিয়ে করবে না?

আধো লজ্জায় আধো বিদ্রূপে শান্তি হেসে উঠ্‌লো। বল্‌লে,—পাগল নাকি? বিয়ে করবার আমার সময় কই—আর করবোই বা কাকে? ভাই দু'টিকে তবে দেখবে কে? বাবার এ ঋণ কোত্থেকে তবে শোধ হ'বে? মাথামুণ্ডু কী যে তুমি বলো।

দীপ্তি বল্‌লে,—তবে চিরকাল তুমি এমনি আইবুড়ো হ'য়ে থাকবে নাকি?

—আমার আবার 'চিরকালটা' তুমি কোথায় দেখলে? আগে বাঁচতে দাও তো। তা, না বাঁচ্‌লেই বা চলছে কেন? আমি ছাড়া ওদের আর কে-ই বা আছে? তা, রইলামই বা না আইবুড়ো—সংসারে আমার কাজের তো কিছু অভাব নেই। বলে' শান্তি বিমনা হ'য়ে টেব্‌লের ওপর থেকে আরেকখানা বই কোলের ওপর টেনে নিলো।

দীপ্তি বল্‌লে,—এই বয়সে কাউকে কোনোদিন ভালোবাসো নি, শান্তি?

—আদার বেপারি জাহাজের খরব কী করে' রাখবো বলো? অতো বাবুয়ানা কি আমাদের পোষায়? ভালোবাসা হ'লেই তো আর হ'লো না, তাকে টিঁকিয়ে রাখবার মুরোদ কই? ভগবান পৃথিবীতে সব লোককেই তো সমস্ত কাজের জন্য উপযুক্ত করে' পাঠান না। কী জানি মিল্‌টনের সেই লাইন্‌টা?

"They also serve who only stand and wait." বলে' শান্তি হেসে ফেল্‌লো।

এবং সেই হাসি মেলাতে-না-মেলাতেই আলো নিভে ঘর অন্ধকার হ'য়ে গেলো।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে' দীপ্তি বল্‌লে,—রাত তো নেহাৎ কম হয়নি দেখছি। তোমাকে একটা চিঠি দেখাতে এসেছিলুম, শান্তি।

—কা'র? তোমার বাবার? খবর তো শুন্‌লুমই। বিয়ে কোথায় হবে?

দীপ্তি দরজার কাছে এগিয়ে এলো; বল্‌লে,—না, বাবারটা তো পোস্‌ট্‌ কার্ড। এটা একটা রঙিন খাম, বিয়ে ঠিক হ'বে জেনে লিখেছে।

দরজার একটা পাল্লা খুলে ধরে' দীপ্তি একটু থাম্‌লো। দেশ্‌লাই জ্বেলে শান্তি ক্যাণ্ডেল্‌ ধরাচ্ছে।

টেব্‌লের ওপর কৌটা ফেলে মোমবাতিটা বসাতে-বসাতে শান্তি বল্‌লে,—ও-সব আমি কিছু বুঝবো না ভাই, আমাকে দেখিয়ে লাভ কী!

পল্‌তেটা খানিক পুড়ে আলো স্পষ্ট হ'য়ে উঠতেই দেখা গেলো দীপ্তি চলে' গেছে। এবং সেই অসহ্য নির্জ্জনতায় করবার কিছুই না পেয়ে হাতের হাওয়ায় শান্তি আলোটা নিবিয়ে দিলো। আবার সেই অন্ধকার, দক্ষিণের জান্‌লার পাখির ফাঁক দিয়ে ও-বাড়ির ঘরে আলো একটু-আধটু দেখা যায়।

*

*　　　　*

দরজা বন্ধ করে' শান্তি তক্ষুনি শুয়ে পড়লো।

এই অন্ধকারে সে তার নিজের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে।

স্কুলে ঢুকেইছিলো সে বেশি বয়সে, এবং তারপর ম্যাট্রিক যখন সে পাস্ করলে তখন তার বাবা তাকে হঠাৎ পাত্রস্থ করবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। গাঁয়ের লোকদের প্ররোচনা একটু ছিলো বটে, কিন্তু বাবার মত ছিলো অতিমাত্রায় মৌলিক ও অসাধারণ। মেয়েদের লেখাপড়া-শেখার মোটেই তিনি বিরোধী নন্, বরং লেখাপড়া শিখলেই তারা পারিবারিক জীবনে লাবণ্য বিস্তার করতে পারবে; কিন্তু সেই দিক থেকেই মেয়ের শিক্ষানুরাগকে তিনি নিজ হাতে নষ্ট করতে চান্ নি। তাড়াতাড়ি তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চাচ্ছেন এই ভেবে যে শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে জীবনে মাধুর্য্য এলেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের লাবণ্য যাবে বিবর্ণ হ'য়ে। একমাত্র সাড়ি পরে' নারী বলে' পরিচিতা হওয়াটাই হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার বিড়ম্বনা। তাই বয়সের স্বাভাবিক সম্পদে দেউলে হ'বার আগেই মেয়েকে তিনি পার করতে চান্।

সে-আশা তাঁর পূর্ণ হ'লো না। মেয়ে দেখাবার আগেই তিনি মারা গেলেন।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে' শান্তি সেই সব কথাই এখন ভাবছিলো। বাবা সেই ফাঁড়াটা উৎরে গেলে এতোদিনে সে নিশ্চয়ই কোন্ এক অপরিচিত পুরুষের দাসত্ব করতে গেছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন, এই বহুবিশ্রুত নীতি-কথাটা এখেনেই বা সে খাটাতে যাবে না কেন? বিয়ে হ'য়ে গেলে জীবন-সংগ্রামের এই কঠিন ও নিষ্ঠুর আনন্দ থেকে সে চিরদিন বঞ্চিত হ'য়ে থাকৃতো। তার স্নায়ু তখন শিথিল, দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ও আকাঙ্ক্ষা পঙ্গু হ'য়ে গেছে। অহোরাত্র এই যে উন্মুখ যুদ্ধমত্ততা—এর তীব্র স্বাদ তা হ'লে সে পেতো না। সে এতো ত্যাগ করতে পারে, এতো সহ্য করতে পারে, এতো প্রতীক্ষা করতে পারে—নিজেকে অলক্ষ্যে এই আবিষ্কার করার অহঙ্কার সে পেতো কী করে'? সংসারে সেই প্রবল মৃত্যু তাকে উলঙ্গ জীবনের সাম্‌নে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে এই নির্লজ্জ সঙ্ঘর্ষে শান্তি ক্ষণে-ক্ষণে নূতন শক্তি সংগ্রহ করছে। কিছুতেই সে হারবে না—এই তার প্রতিজ্ঞা।

বিয়েটা তার জীবনের পক্ষে সামান্য একটা ব্লাউজের প্যাটার্নের মতো তুচ্ছ বাবুগিরি মাত্র—তার চেয়ে কতো বড়ো অসাধ্যসাধন তাকে করতে হ'বে। সে এখন পরিপূর্ণ একটি ব্যক্তি, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, আপনাতে আপনি পরিচিত। সে নিজেই নিজের সারথি। কারুর সে সম্পূরক নয়, কারুর সাহায্যপ্রার্থিনী হ'য়ে সে যুদ্ধে নামে নি, এবং এই একাই তাকে যুদ্ধজয় করতে হ'বে।

অনেক ক্লান্তি, অনেক অবসাদ—তা হোক্—তবু ভাইয়েদের সেই একমাত্র দিদি, মাসান্তে মা তার মাইনের ঐ ক'টি টাকার জন্যে চেয়ে আছেন। বাবার ঋণের টাকাটা শান্তি নিজের নামে লিখে নিয়েছে—তা পরিশোধ করে' তবে সে পরিষ্কার করে' নিজের দিকে চাইতে পারবে। মোহনের পড়া-শোনায় মন নেই, ছোট-খাটো একটা মাষ্টার রেখে দিলে ভালো হয়। আসছে মাসে কিছু ছিট কিনে ওদের তুটো সার্ট তৈরি করে' দিতে হ'বে। মা তো তাঁর নিজের অভাবের কথা কিছুই লেখেন না, কিছু লিখতে গেলে উল্‌টে তাকেই তিনি ভালো দেখে একজোড়া সাড়ি কিন্‌তে বলেন, হাতের মোটা রুলি তু'গাছ ভাঙিয়ে সরু করে' চার-গাছ ঝুরো চুড়ি যেন সে তৈরি করিয়ে নেয়—বানির টাকা আস্তে-আস্তে শোধ করে' দিলেই চল্‌বে। তার চেয়ে সেই টাকায় বাড়িতে একটা চাকর রাখলে কাজ দিতো। তু' বেলা রান্না করে' মাকে আবার বাসন মাজতে হ'তো না।

অন্ধকারে কখন সে তার গ্রামে চলে' গিয়েছিলো. পাশের বাড়িতে কিসের একটা শব্দ হ'তেই শান্তি আবার নিজের কাছে ফিরে এলো। চট্ করে' মনে পড়ে' গেলো আজ শনিবার—রাত এগারোটা কখন বেজে গেছে। হঠাৎ খুসি হ'য়ে উঠে বিছানা ছেড়ে আস্তে-আস্তে দক্ষিণের জানলার ছিট্‌কিনি তুলে সামান্য একটু ফাঁক করলে। হ্যাঁ, আজকেই তো তাঁর ফেরবার কথা।

এখনো তিনি ফেরেন নি। বউটি মেঝের ওপর ছেলেকে কোলে করে' বসে' ঝিনুকে করে' তুধ খাওয়াচ্ছে। বাটির তুধের

চেয়ে বুকের দুধের জন্যেই ছেলেটির বেশি লোভ, দুর্ব্বল ক'টি আঙুল মেলে মা'র বুকের কাপড়ের কাছে আঁকুপাঁকু করছে। বউটি বাটির গায়ে ঝিনুকের শব্দ করে'-করে' ছেলেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছে, আর সুর করে' ছড়া কাটছে :

দেয়া, বাও করো রে,
খোকার দুধ জুড়িয়ে দাও।

একপাশে পেতলের টোপে ভাত ঢাকা, সাম্নে পাড়-মোড়া চটের একখানি আসন, কলাই-করা ছোট্ট একটি প্লেটে পাৎলা করে দু'খানা নেবু কাটা আর একটু নুন। স্বামী তার এক্ষুনি এসে পড়বেন। ব্যাণ্ডেলে না সাঁৎরাগাছিতে কোথায় নাকি ইষ্টিশানে কি কাজ করেন, শনিবারের কাজ চুকিয়ে রাত্রি আর রবিবারের সমস্তটা দিন—রাত দশটা বাজতে-না-বাজতেই আবার তাঁর পাততাড়ি গুটাতে হয়—সেই ভোরবেলায় তাঁর ডিউটি। সপ্তাহান্তে এই ক'টি ঘণ্টার মাত্র সান্নিধ্য। তারি জন্যে বউটি প্রতিমুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত গোণে। আগেভাগেই ছেলেকে দুধ খাইয়ে জামা ছাড়িয়ে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখে—পাছে তার নির্ব্বোধ দৌরাত্ম্যে তাদের এই প্রতীক্ষাপ্রখর মিলনের আনন্দে কোনো ব্যাঘাত হয়। অল্প একটু পাখি তুলে শান্তি চোরের মতো চুপিচুপি সেই দৃশ্যটি আনুপূর্ব্বিক অনুধাবন করে। শনিবারের রাত্রে কখন সেই স্বামীটি ফিরে আসেন তারই প্রতীক্ষায় ঐ বউটির মতো সে জেগে থাকে, ঘুমুতে যেতে পারে না।

তারপর সিঁড়িতে জুতোর শব্দ করতে-করতে যখন তিনি

আসেন, বউটির মতো তারো সর্ব্বাঙ্গ সহসা আনন্দে ও আশায় আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। মূর্ত্তিটা ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হ'তেই বউটি তার অতি-প্রগল্‌ভ আনন্দ লুকোবার লজ্জায় স্বামীরই বুকের মধ্যে মুখ ঢাকে—সেই পরিপূর্ণ, পরুষ আলিঙ্গনের তাপ সহসা শান্তিকে ঘিরে নির্জ্জীব অন্ধকারের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মিলনের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কাটিয়ে উঠ্‌তেই স্বামী ওপরের জামাটা খুলে ফেলে পেছনের বারান্দায় চলে' যান্—আগেই সেখানে বউটি বাল্‌তি ভরে' জল ও সোপ্‌কেস্‌এ সাবান সাজিয়ে রেখেছে—তোয়ালেখানা হাতে নিয়ে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর স্বামী খেতে বসেন—বাটি-উপুড়-করা ভাত তাঁর আঙুলের চাপে ভেঙে-ভেঙে পড়ে, আর পাশে বসে' বউটি আস্তে-আস্তে পাখা করে; কতো কি-সব খুঁটিনাটি কথা—রেল্‌-ইষ্টিশানের গল্প, কোথায় কি নতুন লাইন বস্‌ছে, কবে সেদিন একটা কুলি-কামিন ট্রেনে কাটা পড়লো। বউটির পুঁজিতেও গল্প কম নেই,—খোকার ওঙা-ওঙা কেমন এখন স্পষ্ট মা হ'য়ে উঠেছে, সুতো দিয়ে মশারির সঙ্গে রঙিন একটা বল্ ঝুলিয়ে দিলে কেমন সে হাত-পা তুলে হাসে, ফিডিং-বোতল কিছুতেই সে মুখে তুলবে না। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলেই দেখতে-না-দেখতে দরজায় খিল পড়ে, টুপ্‌ করে' সুইচ্‌টা উঁচু-মুখো ঠেলে দিয়ে স্বামী আলো নিভিয়ে দেন। তখন শান্তির ঘরেও আগাগোড়া অন্ধকার।

বউটি কতো সুখেই না আছে। তার জীবনটা আগাগোড়া সমতল, একেবারে স্বচ্ছন্দ। কোথাও এতোটুকু বাধা নেই,

ছন্দচ্যুতি নেই—একটানা ভাটিয়াল একটি সুর। যা কিছু সে ক্ষয় করে, তারই গৌরবে ধীরে-ধীরে সে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠে। নিজেকে নিঃশেষ করে'ও সে রিক্ত হয় না।

কথাটা আজ এখন মনে হ'তেই শান্তি আর-দিনের মতো ধড়মড় করে' উঠেছিলো, কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন তার আজ ভারি বিস্বাদ ঠেক্‌লো। পুরুষ হ'য়ে জন্মানোই তার উচিত ছিলো, তা হ'লে এমনি উদার বিশ্বাসে বউটি কখনোই তাদের ঘরের এই জান্‌লাটা খোলা রাখতো না। তা ছাড়া লুকিয়ে এই দৃশ্য কল্পনায় অনুরঞ্জিত করে' রোমাঞ্চিত হ'বার লজ্জা তাকে বারে-বারে আজ দংশন করতে লাগ্‌লো। ঐ পরিমিত সীমা-ঘন তুচ্ছ জীবনযাপনে কোথায় কী অহঙ্কার!

শান্তি জান্‌লাটা বন্ধ করে' টেব্‌লের ওপর ফের আলো জ্বালালো। আলোটা নিতান্ত সামনে বলে' দেয়ালে তার মুখের অতিকায় একটা ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ার দিকে তাকিয়ে শান্তি স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইলো। দেখ্‌তে সে কুৎসিত তা সে জানে, কিন্তু সে যে কতো শূন্য এই ছায়ার দিকে তাকিয়ে সে আজ বুঝতে পারলো। নিজেকে সে যেন এখন মুখোমুখি দেখতে পারছে,—হাতের ঝাপ্‌টায় তাড়াতাড়ি সে আলো নিভিয়ে দিলে। এখুনি বউটির স্বামী এসে পড়বেন,—সময় এই হ'য়ে এলো। তারপর তাদের সেই অনর্গল হাসি আর কথা, এবং কথা থেমে গেলে তাদের সেই স্পর্শময় নিঃশব্দ উপস্থিতি। তাঁর বাড়ি পৌঁছবার আগেই তাকে ঘুমিয়ে পড়তে হ'বে!

তবু, দেহ-সম্পদে হোক্ সে কুরূপা, তার সৌন্দর্য্য একমাত্র তার এই নির্ভীক বলশালিতায়, এই নিষ্ঠুর রণোল্লাসে। জীবনকে সে গোলাপের বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখেনি, ঝড়ের আকাশে অবারিত বিদ্যুৎ-দীপ্তির মাঝে মুক্তি দিয়েছে। এতো সহজে পরাজয় স্বীকার করলে তার চলবে কেন? ঐ পরিমিত তুচ্ছ জীবন নিয়ে সে কী করবে?

শিয়রের বইগুলির ওপর অতি স্নেহে বাঁ হাতখানি মেলে দিয়ে শান্তি আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

*

* *

সকাল হ'তেই তাদের কলেজ—চোখে-মুখে জল দিয়ে আঁচলটা দু'হাতে বুকের ওপর সামান্য একটু পাট্ করে' একমাথা রুখু চুল নিয়েই সে বেরিয়ে পড়ে। হস্‌টেলে ফিরে আস্‌তে-আস্‌তে সাড়ে দশটা। আধঘণ্টার মধ্যে স্নান, খাওয়া, বেশবাস। বেশবাসের মধ্যে পারতপক্ষে সাড়িটা বদ্‌লে নেয়, ভিজে চুলগুলিতেই ফাঁস একটা গেরো দিয়ে মাথার ওপর ছোট্ট করে' একটি ঘোম্‌টা তুলে দেয়, হাতে একটা চামড়ার সস্তা ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ক'দিন মুচির একটাও দেখা নেই, জুতোর ঘুন্টি দুটো কবে থেকে ছিঁড়ে পড়ে' আছে।

সেই চিত্তরঞ্জন এভিনিয়ু থেকে একফালি একটা গলি

বেরিয়েছে—তাইতেই কর্পোরেসান্এর সেই স্কুল। বাস্ নেবার সুবিধে নেই—এক, রিক্সা। রোজ-রোজ অতো পয়সা সে কোথায় পাবে? অগত্যা হেঁটেই সে যায়, আসেও তেমনি হেঁটে। চারটেয় তার ছুটি—কখনো-কখনো আগেই বেরিয়ে পড়ে। আগে বেরিয়ে পড়লে সোজা সে হস্টেলে চলে' আসে, চারটেয় বেরুলে সোজা সে বিডন্স্ট্রীটে পড়ে' তার টিউসানির জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। তা, সপ্তাহের মধ্যে যদি দুটো দিন সে দুপুর-বেলা হস্টেলে ফিরে জিরিয়ে নিতে পারে! এক শনিবার আর বুধবার।

আর-আর দিন চারটের পর চিত্তরঞ্জন এভিনিয়ু ধরে' বিডন্-স্ট্রীটের দিকে যাবার বেলায় শান্তি টের পায় তার পেছনে কারা তাকে সমানে অনুসরণ করছে। প্রথম-প্রথম সে তা মোটে আমোলেই আনে নি, কিন্তু পদক্ষেপের দ্রুততা বাড়িয়ে তারা যখন ক্রমে-ক্রমে তার সন্নিহিত হ'বার চেষ্টা করতে লাগ্লো, তখন রীতিমতো সে অস্থির হ'য়ে উঠ্লো। একে-অন্যের মধ্যে কী-সব খোলাখুলি কথা চলে, অন্য চিন্তায় মনকে শত ব্যাপৃত রাখলেও কানে তার কতক এসে ঢোকেই—এবং সে-ই যে তাদের আলোচনার বিষয়ীভূত, তাতে আর তার সন্দেহ থাকে না।

রাগে-দুঃখে শান্তির চোখে জল এসে পড়ে। কিন্তু নিঃশব্দে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কী করবার আছে! জীবনে কতো বড়ো ব্যর্থতাকেই সে হাসিমুখে স্বীকার করে' নিয়েছে,

আর এই ক্লান্তিকর অনাহূত অপমানের সে পাশ কাটাতে পারবে না? জীবন-যুদ্ধে সে একাকিনী, পথে কোথাও তার সঙ্গী নেই, সে নিতান্ত নিঃস্ব ও নিরালা—তাই তারা তাকে এমন অসম্মান করতে সাহস করছে, কিন্তু নীরব উপেক্ষা ছাড়া এই অপমানের কী প্রতিবিধান হ'তে পারে!

কানকে সমস্তক্ষণের জন্যে কালা করে' রাখা অসম্ভব—তা ছাড়া লোকগুলি এতো ঘেঁসে যাচ্ছে যে তাদের উপস্থিতিকে আর উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাদের এগিয়ে দেবার জন্যে শান্তি দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু অসাধারণ তাদের বাধ্যতা—তারাও তেমনি থেমে পড়েছে। এবার তাদের দিকে চোখ না-ফেরানোই শান্তির পক্ষে অসম্ভব ছিলো। দুটো লোক—পোষাকে ভদ্রতা থাকলেও চেহারায় বিন্দুমাত্র শালীনতা নেই। তাদের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত গা রি-রি করতে লাগলো, কিন্তু ফুটপাতের একধারে চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া সে আর কী করতে পারে?

সামনে দিয়ে একটা রিক্সা যেতে দেখে শান্তি তাড়াতাড়ি সেটাকে হাত তুলে ডেকে দাঁড় করালে, দরাদরি না করে'ই সোজা উঠে বসলো। খানিকদূর আসতেই টের পেলো তারাও একটা রিক্সা নিয়ে পিছু-পিছু আসছে, আর সামনের রিক্সাটাকে ধরবার জন্যে তাদের রিক্সায়ালাকে প্রবলকণ্ঠে উৎসাহিত করছে। পেছনের রিক্সাটা একেবারে শান্তির পাশে এসে পড়লো। তখন কোলের ওপর বই মেলে ধরে' ঘাড় হেঁট করে' রুদ্ধ

নিশ্বাসে তা পড়া ছাড়া তার পথ থাকে না। এখানেও এই বই-ই তাকে রক্ষা করে।

কিন্তু রোজ-রোজ এমনি রিক্সা করে' যাওয়াও অসম্ভব। অথচ শনিবার ও বুধবার ছাড়া (সে দু' দিন তার দুপুরেই ছুটি হ'য়ে যায়, এবং কখন সে পড়াতে যায় ঠিক তারা হদিস্ পায় না বলে') প্রত্যহই তাদের রাস্তায় এই হাজিরা দেওয়া চাই। ঘাম্‌তে-ঘাম্‌তে শান্তি পথ ভাঙে, এবং ছেলে হ'য়ে জন্মানোই যে তার কতো উচিত ছিলো তা ভেবে চোখে তার জল এসে পড়ে। তা হ'লে সহজেই সে এই অন্যায় কদাচারকে শাসন করতে পারতো—এমনি করে' নির্লজ্জের মতো হাসতে দিতো না।

হয়েছেই বা না মেয়ে—তাই বলে' এমনি মুখ বুজে সে অপমান হজম করবে নাকি? পুরুষের মতোই সে স্বাধীন, এবং এই স্বাধীনতার সম্মান তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'বে নিজেরই দৈহিক শক্তিতে। একেক সময় হঠাৎ পেছন ফিরে সমস্ত ভঙ্গিটা কঠিন করে' ঐ লোক দুটোকে তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয় মুহূর্ত্তমাত্র প্রস্তুত হ'বার সুযোগ না দিয়ে একটার গাল বাড়িয়ে প্রকাণ্ড একটা চড় মেরে বসে—কথাটা মনে হ'তেই শান্তির কেমন হাসি পায়—এবং ঐ অভিনয়ের কোন্ দৃশ্যে যে যবনিকা পড়বে ভাবতে গিয়ে সারা গা তার শিউরে ওঠে। প্রথমে একটা তুমুল হৈ-চৈ, হয় তো মেয়ে বলে' পথচারী ও পাড়ার বাসিন্দাদের সে দলে পাবে, সব কথা সজল চোখে ও শোকার্ত্ত গলায় সবিস্তারে তাদের

খুলে বল্‌তে হ'বে—সে নিতান্ত একটা থিয়েটারি ঢং—তারপর নিজেদের মুখ বাঁচাতে গিয়ে ও-পক্ষও আর মুখ বুজে থাকবে না, কোথা দিয়ে কী বলে' বসে তার ঠিক নেই, এবং ইচ্ছে করলে কী তারা বল্‌তে না পারে! তারপর শান্তিকে আবার সেই সব কথা সাড়ম্বরে খণ্ডন করতে হ'বে, অনেক সব সাক্ষী মানতে হ'বে, অনেক সব সার্টিফিকেট্ দেখাতে হ'বে—ব্যাপারটা শেষপর্য্যন্ত ফৌজদারি দাঁড়িয়ে যেতে পারে। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে কেলেঙ্কারির আর অন্ত থাকবে না, আত্মরক্ষা করতে গিয়ে চাকরটি সে বাঁচিয়ে রাখতে পারে কি না সন্দেহ।

বিডন-স্কোয়ারের কাছাকাছি এসে তবে তার টিউসানির জায়গা। বাড়ির মধ্যে সোজা ঢুকে পড়ে' শান্তি হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। লোক দু'টো আস্তে-আস্তে তখন সরে' পড়ে।

শান্তি হাতের ছাতাটা ও পায়ের জুতো জোড়া সিঁড়ির নিচে রেখে ওপরে উঠে যায়। প্রকাণ্ড কৌচের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে সরমা ফার্ষ্ট-বুকখানা নাড়া-চাড়া করছে!

বড়-লোকের ঘরের বউ—বয়েস এই ষোলো-সতেরো হ'বে, কিন্তু সমস্ত দেহ ভরে' তার উত্তাল রূপ, রেখার বন্ধন উত্তীর্ণ হ'য়ে ভঙ্গিতে উথ্‌লে পড়ছে। মেয়েও বড়ো ঘরের—এতো দিন লাবণ্যচর্চ্চা ছাড়া আর কিছুতে তার হাত পাকে নি। নতুন বিয়ে হয়েছে—স্বামী আয়-কর আফিসের বড়ো চাকুরে। তাঁর ইচ্ছা, ইংরাজি ভাষার কয়েকটি অন্তত ছিটে-ফোঁটা সরমার

পাতে পড়ুক। অন্তত তার সঙ্গে আলাপ করবার সময় তিনি যেন দুয়েকটা নতুন কথা পান্। একটু যেন মুখ-ফেরানো চলে।

অন্য সময় শান্তির সুবিধে হয় না বলে' এই বিকেলের দিকটাই সে বেছে নিয়েছে। সরমা এই সময় তাকে চা এনে দেয়, কতো রাজ্যের খাবার, কতো রকম সাধ্যসাধনা করে, অথচ নিজে এক কামড় খাবে না। আপিস্ থেকে স্বামী বাড়ি ফিরলে তবে তাঁর সঙ্গে তারো ব্যবস্থা হ'বে। আর, শান্তিই কি না এতো সহজে তার এই শিক্ষয়িত্রীর সম্মান খোয়াতে বসেছে! জলখাবারের ধার দিয়েও সে যায় না, ভঙ্গিতে অবিচল একটি কাঠিন্য এনে সে দূরত্ব বজায় রাখে, টেব্‌লের ওপর বইটা মেলে ধরে' সে বলে: কাল্‌কের পড়া তৈরি হয়েছে তো? বানান্ করুন্—

সরমা ফিক্ করে' হেসে বলে: কখন তৈরি করবো বলুন দিকি। সারা সকালটা শুধু-শুধু উনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করলেন। মিছিমিছি অমন ঝগড়া করলে মেজাজ কারো কখনো ভালো থাকে? আমিও দিলুম কথা শুনিয়ে। মন ভারি খারাপ হ'য়ে গেলো। সারা দুপুর বই আর ছুঁতে পারলুম না।

শান্তি বলে: তবে ডিক্‌টেসান্ নিন্।

সরমা শব্দ করে' হেসে ওঠে; বলে: আপনি অমনি দারোগার মতো মুখ করে' থাকলে আমার ভয় করে। ডিক্‌টেসান্ নিয়ে কী হ'বে?

—না, কিছুই আপনার প্রোগ্রেস্ হচ্ছে না।

—ভীষণ হচ্ছে, বাইরে থেকে আপনি কিছু টের পান্ না। আমাকে কাল উনি চীনে-হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলেন, দস্তুরমতো হ্যাম্এ কামড় দিয়ে এসেছি—শ্বশুরঠাকুর শুনলে আমাদের আর আস্ত রাখবেন না!

তবু বস্বার ভঙ্গিটা একটুও কোমল না ক'রে শান্তি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে: কিন্তু আমার তো একটা কাজ করতে হ'বে, নিন্, লিখুন।

—বা, আপনি যে রোজ দয়া করে' আসেন এই তো আপনার কাজ। এই গাধা পিটিয়ে মানুষ করার অনর্থক কষ্ট করতে যাবেন কেন? বসে'-বসে' আমার সঙ্গে গল্প করলেই তো পারেন —দিব্যি সময় কাটে।

আর গল্প করতে গেলেই তো সরমার স্বামী ছাড়া কোনো কথা নেই। শিক্ষয়িত্রী বলে' শান্তিকে সে এতোটুকু গুরুত্বের মর্য্যাদা দেয় না। ভঙ্গিটা অমন উদাসীন ও রুক্ষ করে' না রাখলে খুসিতে সরমা কখন তারই কোলের ওপর উছলে পড়তো।

শান্তি বলে: কিন্তু আমাকে তো এমনি বসে' থাকার জন্যে রাখা হয়নি।

সরমা কৌচের ওপর আরো একটু বিস্তৃত হ'য়ে বসবার ভঙ্গিটা শিথিল ও নরম করে' আনে; বলে: আপনিও যেমন, বসে' থাকলেই বা আপনাকে কে তাড়ায়! ফাঁকি দিতে না পারলে কর্ত্তব্যকাজে সত্যিই কোনো সুখ নেই। আর আপনাকে

সত্যি বলছি শান্তি-দি, আমার মাথায় ও-সব মাথামুণ্ডু কিচ্ছু ঢোকে না।

শান্তি হাসি চাপতে গিয়ে মুখ আরো গম্ভীর করে' তোলে।

টেব্‌লের ওপর থেকে বই-খাতা ঠেলে দিয়ে সরমা বলে: কী হ'বে এ-সব ছাই-পাঁশ মাথায় ঢুকিয়ে? ওঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আমার এই বাঙলা ভাষাই যথেষ্ট। আর বাঙলা ভাষা কতো যে মিষ্টি! আপনাদের মতো অমনি গ্যাড়্-ম্যাড়্ করতে গেলেই হয়েছে—গানের আসরে গদা-হস্তে ভীমের প্রবেশের মতো সব মাটি হ'য়ে যাবে।

আবার বলে: আমার তো আর পেটের ধান্দায় চাকরি খুঁজতে হ'বে না, চাকরি তো আমি পেয়েই গেছি—একেবারে ইম্পিরিয়্যাল সার্ভিস, কী বলেন? মিছিমিছি কী হ'বে এ-সব হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ করে'?

এমন সময় আপিস থেকে সরমার স্বামী ফিরে আসেন। সরমাকে মাষ্টারের কাছে পড়তে দেখে ঘরের মধ্যে দ্রুত একটা উঁকি মেরেই তিনি তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকেন! অরণ্যে বসন্তের আবির্ভাবের মতো, সরমার সারা দেহে যৌবন সহসা ঊর্মি-চূড়ার মতো আলোড়িত হ'য়ে ওঠে।

অভিভাবক কাছেই উপস্থিত ভেবে শান্তি অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে, তাড়াতাড়ি বই-খাতা টেনে এনে প্রায় ধমক দিয়ে বলে: লিখুন এবার, কোনোদিনই পড়া আপনি তৈরি করবেন না। এ রকম করলে কী করে' চলে বলুন্। নিন্।

দু' হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে সরমা বলে: আজ থাক্, শান্তি-দি। আমি এবার উঠি।

—এখুনি উঠ্‌বেন কি? এক লাইনো আপনার পড়া হয় নি। বসুন্।

—আপনি কিচ্ছু বোঝেন না, শান্তি-দি। আমার পড়ায় অমনোযোগের জন্যে যার কাছে আপনি নালিশ করছেন, পড়া এখন বন্ধ করলে সব চেয়ে তিনিই যে বেশি খুসি হ'বেন। এইমাত্র আপিস্ থেকে ফিরলেন, এখন চারিদিকে ঘরের শুকনো দেয়াল দেখলে কখনো ভালো লাগে? আপনিই বলুন না। তা ছাড়া, উনি যে আপিস থেকে ফিরলেন সে-খবরটা ঢাক পিটিয়ে রাষ্ট্র করার চালাকিটা ওঁর ধরতে পেরেছেন তো? অমন লোকের জন্যে মায়া না করে' পারে? বলে' সরমা উঠে পড়লো।

শান্তি কঠিন হ'য়ে বলে: কিন্তু আমি যে এসেছি—আধঘণ্টাও হয় নি।

—ভালোই তো। সরমা খুসিতে টল্‌মল্ করতে থাকে: আপনার খাটুনিই বরং বেঁচে যাচ্ছে,—আমারো। আধ ঘণ্টাই ঢের, যেন কাট্‌তে চায় না—কখন উনি আপিস্ থেকে ফেরেন!

শান্তি বলে: অন্য সময় বদ্‌লে নেবার সুবিধে হ'লে—

—খবরদার ওটি করবেন না, শান্তি-দি। আমারই যে সময় হ'বে না। আপিস থেকে ফেরার চাইতে আপিসে যাবার বেলায়ই যে বেশি সমারোহ। তারপর আজকাল আবার কথায়-কথায় রাগ করতে শিখেছেন। কী হ'বে এই সব পড়ে'শুনে

অকাল বসন্ত

*

* *

তারপর একদিন সেই লোক দুটোর উৎসাহ অত্যন্ত বেড়ে গেলো, পেছন থেকে একজন আল্‌তো করে' শান্তির আঁচলটা টেনে ধরলো।

শান্তি কী করবে কিছু ঠিক করবার আগেই অন্যদিককার ফুটপাত থেকে একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক সাঁ করে' এই পারে ছুটে এলো—হাতে তার একটা চেন্‌-বাধা কুকুর। কিছু জিগ্‌গেস করবার আগেই লোক দুটো পাশের গলি দিয়ে সরে' পড়েছে।

লজ্জায় শান্তি তখন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। যুবক জিগ্‌গেস করলে: কী ব্যাপার?

শান্তি স্নিগ্ধ গলায় বল্‌লে,—আমার সঙ্গে চলুন, বলছি। এখানে এখুনি ভিড় জম্‌তে সুরু করেছে।

ফুটপাত ধরে' বিডন্‌ষ্ট্রীটের দিকে এগোতে-এগোতে যুবক বল্‌লে,—তখন থেকে দেখছি আপনি 'ফলোড্‌' হচ্ছেন, লোক দুটো কে?

—ক' মাস থেকেই আমাকে ওরা জ্বালাতন করে। ঐ প্রাইমারি ইস্কুল্‌টায় আমি টিচারি করি, এ-সময়টায় ইস্কুল ছুটি হ'লে টিউসানি করতে যেতে হয়, সেই প্রায় বিডন্‌-স্কোয়ারের

কাছে। আর রোজ ঐ দুটো লোক আমার পেছনে হাঁটতে থাকে।

—বলেন কি! ক' মাস থেকে! লোক দুটো যে ক্লীন ভেগে পড়লো। আমি এক্ষুনি ওদের কুকুর লেলিয়ে দিতাম; কিছু শিক্ষাই যে ওদের দে'য়া হ'ল না।

শান্তি আশ্বস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—আপনাকে আস্‌তে দেখেই সরে' পড়েছে। বোধহয় এইবার চুপ করে' যাবে।

—না, বলা যায় না। দেখি, কী করতে পারি, বের আমি ওদের করবোই। আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?

—আমার সেই টিউসানিতে।

—চলুন। সঙ্গে একটা দারোয়ান নিতে পারেন না?

—ইস্কুল থেকে নিলে তাকে আমার এক্‌সট্রা দিতে হয় আর, এইটুকুন তো মাত্র পথ।

—আপনাকে একা-একা এমনি আসা-যাওয়া করতে দেখেই ওদের এই বেজাতীয় সাহস বেড়েছে। দেখি, আমি ওদের ছাড়ছি না।

দু'জনে বিড্‌ন-ষ্ট্রীটে পড়ে' নিঃশব্দে আরো খানিকক্ষণ হেঁটে এলো। হঠাৎ থেমে পড়ে' যুবক বল্‌লে,—এই হচ্ছে আমাদের বাড়ি, আর আমার নাম হচ্ছে রণেন মজুমদার।

কথাটা এমন সুরে বলা হ'লো যেন রণেন এক্ষুনি বিদায় নিয়ে তার বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে। শান্তি আরেকটু হ'লে নমস্কার করতে হাত তুলছিলো, কিন্তু রণেন তার সঙ্গে-সঙ্গেই আসছে।

শান্তির ইচ্ছা হ'লো বলে—আর কেন উনি কষ্ট করে' আস্‌ছেন? কিন্তু এ নিতান্তই প্রাণহীন ভদ্রতার মতো শোনাবে—অন্তত যে তাকে এই বিপদ ও লজ্জা থেকে উদ্ধার করলো ও যে পাশে আছে বলে' তার এখন রীতিমতো সাহস হচ্ছে, তার প্রতি এই মিথ্যা ও মামুলি চাটুবাদটা তার মানায় না।

আরো খানিকটা রাস্তা নিঃশব্দে অতিবাহিত হ'লো। শান্তি ফিরে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বল্‌লে,—এই বাড়িতে আমি পড়াই। আচ্ছা, আসি, নমস্কার। বলে' সুন্দর করে' একটু হেসে ছোট একটি নমস্কার করে' শান্তি ভিতরে অন্তর্হিত হ'লো।

কিন্তু আজো সরমা পড়বে না। তার আজ সর্দ্দি করে' চোখ-মুখ ছল্‌ছল্‌ করছে। ইউক্যালিপটাস্-এর তেলে কিছু হচ্ছে না, গরম জিলিপিও সে ঢের খেলো, উনি এখন তাকে ফুটবাথ দেবেন। তারি জন্যে আগে-ভাগেই তিনি আপিস থেকে বেরিয়ে পড়েছেন।

—এ তো আপনার ভালোই হ'লো, শান্তি-দি। অনর্থক আধঘণ্টাও কাটতে দিলুম না। এখুনি আপনি পালান, পড়াবার নাম শুনলে গরম জলের গাম্‌লা নিয়ে না উনি তেড়ে আসেন! বলে' ভারি খন্‌খনে গলায় সে অনর্গল হেসে উঠ্‌লো।

নিষ্প্রাণ গলায় শান্তি বল্‌লে,—আমার কী। আমার মাইনে পেলেই হ'লো।

—নিশ্চয়। আমরা তো ভাবছি আপনার মাইনে আরো বাড়িয়ে দেব, প্রায় রোজই কষ্ট করে' এসে শুধু-শুধু ফিরে

যান। এবার থেকে যেদিন একদম পড়বো না শান্তি-দি, আপনাকে চিঠি লিখে জানাবো।

শান্তি হেসে বল্‌লে,—তা হ'লে রোজই আপনি একখানা চিঠি লিখবেন।

—কিম্বা এক চিঠিতেই আপনাকে একমাসের লম্বা ছুটি দেব, কেবল মাসের পয়লা তারিখে আসবেন এতোদিন প্রতীক্ষা করার দক্ষিণা নিতে! তা হ'লেই ভালো হ'তো, কিন্তু ওঁর কাছে ভিজে বেরাল সাজতে হ'বে যে। মুখোসটা ঠিক রাখতে হ'বে—নইলে বিপদ আমাদের দু'জনেরই, শান্তি-দি।

—আচ্ছা, এবার তবে আসি। বলে' নিচে নেমে জুতো পরে' ছাতা কুড়িয়ে শান্তি বাইরে চলে' এলো।

দেখলে কুকুর-হাতে রণেন তখনো দাঁড়িয়ে আছে।

শান্তি বিব্রত হ'য়ে পড়লো; বল্‌লে,—আমার জন্যে এখনো আপনি দাঁড়িয়ে আছেন নাকি?

রণেন বল্‌লে,—হ্যাঁ, চলুন, আপনাকে বাড়ি পর্য্যন্ত রেখে দিয়ে আসি। বাড়ি থেকে আসা-যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করতে পারেন না?

এক পা দু' পা করে' চলতে-চলতে শান্তি বল্‌লে,—বাড়ি কোথায়, থাকি সেই হেদোর কাছে একটা প্রাইভেট হস্‌টেলে। বন্দোবস্ত আর কী করবো? তা থাক্‌, কষ্ট করে' আপনাকে আর এগিয়ে দিতে হ'বে না, আমি একাই যেতে পারবো। এ-সময় আর কেউ উৎপাত করতে আসে না।

যেন রণেনই এখন উৎপাত সুরু করেছে এমনি ভাব দেখিয়ে শান্তি জোরে-জোরে পা ফেলতে লাগলো। রণেন বল্‌লে,—কিন্তু আমার বাড়ি পর্য্যন্ত তো আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি।

শান্তির পদক্ষেপগুলি আবার মন্থর হ'য়ে এলো।

এই তাদের বাড়ি—শান্তি স্পষ্ট তা চিনে রেখেছে। বাইরে থেকে দেখতে অট্টালিকাটা শান্তির অসম্ভব স্বপ্নের মুহূর্ত্তে উচ্চতম আকাঙ্ক্ষাকেও ছাড়িয়ে গেছে। হ্যাঁ, কুকুর নিয়ে রণেন সেই বাড়িতেই ঢুকলো।

বাকি পথটা কাট্‌লো তার সেই মা'র কথা নিয়ে, মোহন আর মিণ্টুর ভবিষ্যতের কল্পনা করে', ছুটি হ'লে কা'র জন্যে সে কোন্ জিনিস কিনে নেবে সেই চিন্তায়!

\+

\+ +

তার পর দিন চারটের সময় ইস্কুল থেকে বেরিয়ে শান্তি দেখতে পেলো রণেন গেইটের কাছে কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শান্তি একটু হাসলো। রণেন বল্‌লে,—ক'দিন আমি আপনাকে এস্কর্ট করে' দেখি—বেটাদের নাগাল পাই কি না।

কতো দূর এগিয়ে এসেই পেছনে ফিরে তাকিয়ে শান্তি বল্‌লে,—আপনার ভয়ে ওরা আর ঘেঁস্‌ছে না, এবার ওদের দস্তুরমতো ভয় ধরে' গেছে।

—আসুক না এগিয়ে। রণেন তার বলিষ্ঠ হাতে কুকুরের চেন্‌টা টেনে ধরে' বল্‌লে,—এই আমার মুসোলিনিকে দেখছেন, একবার লেলিয়ে দিলেই কামড়ে একেবারে টুকরো-টুকরো করে' ফেল্‌বে। তার পর পকেটে আমার এই হাণ্টার।

সত্যি শান্তির কেমন-যেন এখন অত্যন্ত নির্ভাবনা লাগে, দিব্যি অনায়াসে গল্প করতে-করতে দু'জনে তারা পথ চলতে থাকে। কুকুরটা থেকে সান্নিধ্যে একটু অন্তরাল এনে দিয়েছে।

শান্তি হেসে বল্‌লে,—কিন্তু আপনি চলে' গেলেই আবার হয়তো সূর্য্য-চন্দ্র দুজনে সমানে উদয় হ'বেন।

রণেন বল্‌লে,—না, না, সূর্য্যচন্দ্রবধ সমাধা না করে' আমি ছুটি নিচ্ছি না। আপনার ভাবনা নেই।

সরমার বাড়ি থেকে বেরিয়েও শান্তি রাস্তায় রণেনকে প্রত্যাশা করে। তারপর তার বাড়ি পর্য্যন্ত এসে হঠাৎ দেহের ক্ষিপ্রতা বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি নমস্কার করে' বলে: আচ্ছা, এবার চলি। অনেক ধন্যবাদ।

ধন্যবাদটা ক্রমে-ক্রমে উঠে যায়।

*

*　　　　*

চারটে বাজতে-না-বাজতেই শান্তি অস্থির হ'য়ে ওঠে, গেইট্‌ দিয়ে বেরিয়ে এসেই রণেনকে দেখে তার মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে' গভীর তৃপ্তির একটি ছায়া নামে। আস্তে-আস্তে রণেনের

হাত থেকে কুকুরের চেনটা কখন খসে’ গেছে, শান্তির ছাতাটা সে আজকাল মাথায় ধরে। অর্দ্ধেক ছাতার বাইরে গিয়েও শান্তি ব্যবধানটা প্রশস্ত করতে পারে না, আবার আদ্ধেক কখন ভেতরে চলে’ আসে।

শান্তি রণেনদের বাড়ির কাছে এসে অল্প একটু থেমে হেসে নমস্কার করে’ রোজ বিদায় নেয় না, মাঝে-মাঝে অন্তঃপুরেও ঢুকে পড়ে। আজকাল বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে তার ভাব হ’য়ে গেছে, রণেনের মা’র কাছে সে তার বাড়ির গল্প করে, আধুনিক কালের দারিদ্র্যের ইতিহাস নয়—সেই সেকেলে তার ঠাকুরদাদা কবে কোন্ ডাকাতের দল ধরে’ দিয়ে সরকারের থেকে ইনাম পেয়েছিলেন, তার কথা। সব চেয়ে মজা এই, বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে’ রণেনের সঙ্গেই সে আলাপ করতে পারে না।

বনেদি বাড়ি—ঐশ্বর্য্যে ঘর-দোর গমগম্ করছে। শান্তি যেন কেমন হাঁপিয়ে ওঠে।

না, শান্তির সময় নেই, সংসারে তার অনেক কাজ। ছোট ভাই দুটিকে মানুষ করতে হ’বে, বাবার ঋণটা শোধ না করলেই নয়—জীবনের তুচ্ছ বিলাসিতায় তার রুচি নেই। মাঝে-মাঝে বিশ্রামের জন্যে সে লুব্ধ হ’য়ে ওঠে বটে—কিন্তু এই ক্ষমাহীন যুদ্ধমত্ততায়ই তার সত্যিকারের আশ্রয়। স্বপ্নের রঙিন মুখোস খুলে ফেলে রূঢ় জাগ্রত রৌদ্রে সে অবতীর্ণ হ’লো।

সরমাকে শান্তিই যা-হোক্ চিঠি লিখলে। লিখলে, টিউসানি সে আর করতে পারবে না।

সরমা নিয়মমতো পড়ে না বলে' নয়, পথচারীদের উৎপাতের জন্যে ঐ রাস্তাই সে ছাড়তে চায়। কারণটা অবিশ্যি সরমা জান্‌তে পারলো না। তবু কী মনে করে' ফার্ষ্ট-বুকটা কুটি-কুটি করে' ছিঁড়ে ফেলে স্বামীর কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সদ্য সূর্য্যোদয়

অক্ষয়বাবু তাঁর বসবার ঘরে অস্থির হ'য়ে পাইচারি করছেন। বাঁ হাতের দু' আঙুলের ফাঁকে আধ-খাওয়া চুরুটটা কখন নিবে গেছে। চাকর ছোট উইকার্-টেব্‌লে চা ও কয়েক টুক্‌রা ফল রেখে গেছে—তা পর্য্যন্ত তিনি ছোঁন্‌নি। অথচ এ-সময়টায় চা তাঁর না হ'লেই নয়। কটন্‌-মিল্‌এর ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাছে ঐ জরুরি চিঠিটা তাঁর শেষ করা উচিত ছিলো। আজ্‌কে রাত্রের ডাকে গেলে কাল নিশ্চয়ই চিঠিটা তার হস্তগতো হ'তো—কাল্‌কেই তার পাওয়া চাই। কিন্তু চেয়ার টেনে সঙ্কুচিত হ'য়ে বসবার কথা তিনি ভাবতেই পারছেন না। খানিকক্ষণ চিন্তার শৃঙ্খলা ও স্পষ্টতা থেকে তিনি অব্যাহতি চান্‌। শরীরকে কোনো একটা অনির্দেশ্য ব্যায়ামে ব্যাপৃত রেখে মনকে তিনি খানিকক্ষণের জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু শরীরকে অলস করতে গেলেই চারিদিকের প্রশস্ততা হঠাৎ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে—তখন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নিজেকে অনুধাবন করা ছাড়া আর উপায় থাকবে না।

ওপরের ঘর থেকে কেউ কেঁদে উঠ্‌লো নাকি? অক্ষয়বাবু শ্রুতিশক্তিকে তীক্ষ্ণ করবার চেষ্টায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। না, কান্না নয়, আকাশে হঠাৎ মেঘ করে' জোরে হাওয়া দিয়েছে। আশ্বস্ত হ'য়ে অক্ষয়বাবু জান্‌লায় এসে দাঁড়ালেন। আকাশের যা চেহারা, এখুনি জল এসে পড়বে। জল এসে গেলেই মুস্কিল, সমস্ত ঘরে নির্জ্জনতা নিবিড় হ'য়ে উঠতে থাকবে। তখন নিজের দিকে না-তাকিয়ে আর উপায় নেই—অক্ষয়বাবু মনে-মনে কেঁপে উঠলেন। দরকার নেই, তার চেয়ে আগেই

বেরিয়ে পড়া ভালো—সোজা মহেন্দ্রবাবুর তাসের আড্ডায়ঃ কোন্ বাজিতে হাতে নতুন কোন্ তাসের সিরিজ্ আসে, কোথায় কখন কী ফিনেস্ করতে হয়, তারই উদ্দীপনায় নিজেকে খানিকটা সময় চঞ্চল রাখা যাবে। বাড়ি যখন ফিরে আসবেন, তখন নিশ্চয়ই মেঘ কেটে গেছে, মুহূর্ত্তগুলির রঙ তখন ঠাণ্ডা, আবহাওয়াটি তন্দ্রাতুর।

দরজার কাছে এসে অক্ষয়বাবু ডাকলেন : শ্রীপতি!

চাকর এসে হাজির।

—আমার রেইন-কোট আর ছাতাটা নিয়ে আয় ওপর থেকে। জল্‌দি। বেরুবো একবার।

কিন্তু বল্‌তে-বল্‌তেই অসীমোৎসারে আকাশ ভেঙে পড়লো! শ্রীপতি ছাতা আর রেইন্-কোট নিয়ে এলে অক্ষয়বাবু বিরক্ত-মুখে চুরুট ধরিয়ে বললেন,—রাখ্ ও-গুলো। বেরুনো গেলো না দেখছি। হ্যাঁ রে, তোর দিদিমণি কী করছে জানিস্?

জিনিসগুলো গুছিয়ে রেখে শ্রীপতি বল্‌লে,—চা দিতে গিয়ে দেখি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। কিছুতেই খুললেন না।

—খুল্‌লেন না কী রে? এই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? যাই, দেখে আসি গে।

বলে' ওপরে যাবার সামান্য একটু ব্যস্ততার ভঙ্গি করতেই শ্রীপতি অন্তর্হিত হ'ল। চাকরকে বিদেয় দিয়ে তক্ষুনি তিনি উপরে উঠে গেলেন না যা-হোক্। আবার তেমনি অস্থির পায়ে পাইচারি সুরু করলেন। ছবি নিশ্চয়ই কখনো ঘুমিয়ে পড়ে নি—এই কি

তার ঘুমোবার সময়!—বড়ো জোর বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে। নিজেকে নিয়েই সে এখন ব্যস্ত,—আকাশময় বিশাল শূন্যতায় তার সম্পূর্ণতা! হয়তো কাঁদছে, হয়তো বা চুপ করে' বসে' বৃষ্টি দেখছে,—মেয়েরা এমন অবস্থায় কী যে করে অক্ষয়বাবু তা ভেবে স্থির করতে পারলেন না। কিন্তু দরজা খুল্‌লো না কী-রকম! একটা সাড়া পর্য্যন্ত দিলে না। মুহূর্ত্তে অক্ষয়বাবুর মুখ-চোখ ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো, গায়ে ঘাম দিলো, হঠাৎ যেন আর চলতে না পেরে শরীরটা স্তব্ধ, দৃঢ় হ'য়ে গেলো। বোকা মেয়েটা আত্মহত্যা করে নি তো? হয়তো অনেক ডাকাডাকির পর কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে যখন লোকজন লাগিয়ে দরজা ভেঙে ফেলবেন, তখন দেখা যাবে ছবির পাণ্ডুর ঠাণ্ডা মৃত দেহটা মেঝের উপর নীল হ'য়ে পড়ে' আছে। অক্ষয়বাবু চোখের সামনে সেই অপরূপ ব্যর্থতার নিষ্ঠুর চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। আর প্রতিকার নেই; যাকে জীবনে সুখী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাঁর এতোদিনকার এই অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনা, সমস্তই ব্যর্থ হ'য়ে গেলো, সংসারে সেই একমাত্র তাঁর মেয়ে—তাঁর ঘূর্ণ্যমান আহ্নিকগতির অচপল মেরুদণ্ড—সেই বুঝি আজ ভেঙে যেতে বসেছে। শরীরে হঠাৎ বলসঞ্চার করে' অক্ষয়বাবু দ্রুতপায়ে উপরে উঠতে লাগলেন। গলার কাছে হৃৎপিণ্ড ধুক্‌-ধুক্‌ করছে, ঢোঁক গেলা যাচ্ছে না, কুইনিন্‌-খাওয়া রুগীর মতো কানের মাঝে হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি এঞ্জিন গর্জ্জন সুরু করলো। সিঁড়িটা স্তব্ধশ্বাস দেহের মতো অসাড়, অনড়—আলোটা জ্বালা হয়নি বলে' আবহাওয়াটা কেমন-যেন মূর্চ্ছিত,

শোকাচ্ছন্ন—মৃত্যুর ঘ্রাণে যেন ঘন, গম্ভীর হ'য়ে আছে। অক্ষয়বাবুর হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগলো, দেহের ভার আর বইতে পারবে না। তবু রেলিং ধ'রে-ধ'রে আস্তে-আস্তে তিনি উঠতে লাগলেন। সেই তাঁর ছবি—এখন মেঝেময় ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে প'ড়ে আছে। শেফালির বৃন্তের মতো নরম, রক্তাভ তার দেহ—এখন একেবারে নীল, যে-নীলে প্রেমের অবিনশ্বরতার আভাস, যে-নীলে দৃষ্টি-উত্তীর্ণ সুদূর দিগন্তের ইসারা! বাপের উপর সে চমৎকার প্রতিশোধ নিলো যা-হোক্। এতো দিন ধ'রে তিনি এই ছবির জন্যই প্রাণপণে টাকা জমিয়ে এসেছেন, লেখাপড়া শেখাচ্ছেন—তিন বছর বাদে এম্-এ পাশ্ করতে পারলে ডক্টরসিপের জন্যে তিনিই তাকে সঙ্গে ক'রে বিলেত নিয়ে যাবেন ব'লে এখন থেকেই তোড়-জোড় করছেন—সে লণ্ডনে পড়বে, আর তিনি কন্টিনেণ্ট ঘুরে বেড়াবেন—তার নামে গেলো-হপ্তায় de soto-র অর্ডার গেছে। সব এক নিমেষে ফুরিয়ে গেলো। এতো যার সুখ-সুবিধা, এতো যার স্বাধীনতা, সে কি না সামান্য একটা মুখের কথায় এমনি অকাতরে পরাজয় স্বীকার করবে! এতো পড়া-শুনো ক'রে কাব্য-উপন্যাস ঘেঁটে, এই সে শিখলো এতো দিনে! অক্ষয়বাবু আরেকটু হ'লে চেঁচিয়ে উঠতেন, কিন্তু অর্দ্ধেক পথে উঠে তিনি সুইচ্ পেলেন। অন্ধকার এতোক্ষণে পথ ছেড়ে দাঁড়ালো।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ—প্রথম টোকার কোনো উত্তর পাওয়া গেলো না। বৃষ্টির শব্দ ডুবিয়ে অক্ষয়বাবু দরজায় আবার ধাক্কা দিলেন। ঘরের ভেতরে সিল্ক্এর সাড়ির ঝল্মলানি শোনা

গেলো, কিন্তু সেটা সাড়ির শব্দ না জলের ছাঁট—স্পষ্ট তাঁর ঠাহর হ'ল না। দরজায় আবার আঘাত করলেন।

ভেতর থেকে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন এলো : কে ?

ভয় নেই—ছবির স্বর, স্পষ্ট ছবির স্বর! তাতে এক ফোঁটা কান্না নেই, কুণ্ঠা নেই,—খানিকটা যেন ভয়ের জড়িমা আছে, হয়তো বা প্রচ্ছন্ন প্রসন্নতা। বিশ্লেষণ করবার দরকার নেই—সে যে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে নি, এই যথেষ্ট। সে যে তার স্নায়ুগুলোকে গুটিয়ে কুঁকড়ে পড়ে' নেই, এই তার গভীর গৌরবের কথা।

অতিললিত স্বরে ছবি আবার শুধোল : কে ?

অক্ষয়বাবু নিঃশব্দে নামতে সুরু করলেন। গলা বড়ো করে' নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করতে কেমন তাঁর লজ্জা করতে লাগলো। মেয়ের নির্জ্জনতার বেদনায় তিনি উঁকি মারতে এসেছেন। বিচার-কর্ত্তার নিজে দাঁড়িয়ে অপরাধীর দণ্ডবিধান দেখার মধ্যে নির্ম্মম বর্ব্বরতা আছে—সেটা আর তবে শাসন নয়, বন্য জিঘাংসুতা। অক্ষয়বাবু সুইচ্ ঠেলে সিঁড়ি অন্ধকার করে' দিলেন। এরি মধ্যে ছবি নিশ্চয় তাঁকে তার ঘরে আশা করতে পারে না। দরজায় টোকা শুনে হয়তো ভেবে থাকবে প্রদোষই লুকিয়ে আরেকবার এসেছিলো—শেষ বিদায় নিতে। এখুনিই হয় তো দরজা খুলে ছবি বাইরে চলে' আসবে। অক্ষয়বাবু তাড়াতাড়ি সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে অন্ধকারে লুকিয়ে ছবির দরজা-খোলার অস্ফুট আওয়াজের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু দরজা খুল্‌লো

না। দরজা খুলেই বা হ'বে কী! সামনেই অতন্দ্র প্রহরীর মতো দেয়াল উদ্ধত হ'য়ে আছে।

হ্যাঁ, প্রদোষ আজ এসেছিলো। প্রায়ই হয়তো সে আসে, আর-আর দিনের চেহারা তার বিনয়নম্র, শালীন-শোভন, খানিকটা বাধিত থাকবার ভাব মেশানো; কিন্তু আজ তার আচরণে ও পোষাকে কেমন-একটু বিদ্রোহের রঙ দেখা যাচ্ছিলো। হঠাৎ সে অক্ষয়বাবুর বসবার ঘরে এসে হাজির—তিনি তখন সেই কটন্‌-মিল্‌এর ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাছে জরুরি চিঠিটা সবে আরম্ভ করেছেন। তার উপস্থিতিটা এমন উগ্র যে অক্ষয়বাবুকে টেব্‌লের থেকে মাথা তুলে খাড়া হ'য়ে বসতে হ'ল। চুরুট কামড়ে তিনি জিগ্‌গেস করলেন: কী ব্যাপার?

প্রদোষ একটুও না ঘাব্‌ড়ে টেব্‌লের ধার ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছে। কেশে গলাটা পর্য্যন্ত তার পরিষ্কার করতে হ'ল না। Viva-Voce-পরীক্ষা-দিতে-আসা স্মার্ট ছাত্রের মতো অসহিষ্ণু কণ্ঠে সে বল্‌লে,—ছবির সঙ্গে আমার বিয়ের মত নিতে এসেছিলাম।

কথাটা বুলেট্‌এর মতো অক্ষয়বাবুর কানের মধ্যে গিয়ে বিদ্ধ হ'ল। হাত থেকে কলমটা খসে' পড়লো, মুখের চুরুট তেমনি নির্ব্বোধের মতো দাঁত দিয়ে কামড়ে রইলেন। প্রদোষ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো—এতোদিনের এই অবারিত প্রশ্রয়ের পর আজ তাঁর চোখ কপালে তুললে চল্‌বে কেন? সামান্য স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় হাতে তার অল্প-অল্প ঘাম দিয়েছে, পকেটের রুমালে ডুবিয়ে ঘামটা সে মুছতে লাগলো। মুখে তারো একটা সিগারেট বা চুরুট থাকলে

অনেক সুবিধে হ'ত—এই স্থূল নিঃশব্দটা এতো ক্লান্তিকর লাগতো না। কথাকে ঢের বেশি জীবন্ত, ভঙ্গিকে ঢের বেশি উজ্জ্বল করার পক্ষে আনুষঙ্গিক অমন একটা অবলম্বন দরকার—দেখতে নিরীহ, কিন্তু অস্ত্রের মতো প্রবল। সিগারেটের অভাবে পকেট থেকে গরদের ফুরফুরে রুমাল বের করে' প্রদোষ কপাল ঘস্‌তে লাগলো। বক্তব্যটাকে প্রাঞ্জল করবার চেষ্টা করলে: ছবিকে আমি বিয়ে করতে চাই। তার মত আছে। তার মত পেয়ে এবার আপনার মত নিতে এসেছি।

অক্ষয়বাবু সহজে তাঁর সেই অপ্রাকৃতিক উত্তেজনা দমন করতে পারলেন না। চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে' মুঠিতে চেপে অতি রুক্ষ স্বরে বল্‌লেন: তুমি? তুমি ছবিকে বিয়ে করবে?

প্রদোষ বল্‌লে: হ্যাঁ, ছবি তাই স্থির করেছে। তাকে ডেকে জিগ্‌গেস করুন।

অক্ষয়বাবু আরো জোরে হাতলটা চেপে ধরে' বল্‌লেন: তার একার মতই যে যথেষ্ট নয় তা তুমি জানো দেখছি। তাই আমার কাছে তোমাকে আসতে হয়েছে। আমার মত নেই, মত দেব না।

প্রদোষ তা জান্‌তো, কিন্তু এক নিমেষে তার মুখ-চোখ ছাইয়ের মতো সাদা হ'য়ে গেলো। শুকনো গলায় বল্‌লে,—কেন আপনার মত নেই জান্‌তে পারি?

—তুমি তার উপযুক্ত নও বলে'।

—কিসে নই? আমি তাকে ভালবাসি এই কি আমার উপযুক্ততার একমাত্র প্রমাণ নয়?

অক্ষয়বাবুর কুটিল কঠিন ভঙ্গিটা সহসা শিথিল হ'য়ে এলো। টেব্‌লের বিপর্য্যস্ত কাগজপত্রগুলো অমনস্কের মতো নাড়া-চাড়া করতে-করতে তিনি বল্‌লেন,—একমাত্র তুমি ভালবাসলেই তো চলবে না।

নিমেষে প্রদোষের সমস্ত শরীর ফুলন্ত অরণ্যের মতো দীপ্যমান হ'য়ে উঠলো। পরিপূর্ণ, উচ্ছ্বসিত গলায় সে বল্‌লে,—প্রকৃতির নিয়মে কোনো স্বেচ্ছাচারই চলে না—সামঞ্জস্য না ঘটলেই তা অসুন্দর। আমি যদি একা ছবিকে চাইতাম, বা ছবি যদি একা আমাকে চাইতো, তা হ'লেই সে-স্বেচ্ছাচারের নাম হ'ত লালসা; কিন্তু আমরা দু'জনেই পরস্পরকে চাই বলে' তা হ'ল প্রেম। ছবিকে ডাকুন, সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে জিগ্‌গেস করে' দেখুন আমি মিথ্যে বলছি কি না।

অক্ষয়বাবু ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। অস্পষ্ট করে' ছবিকে একটু দেখা গেলো—পরনে তার চায়না-ব্লু সিল্ক্‌—যুদ্ধে যে-রঙের অর্থ হচ্ছে গাঢ় বিশ্বস্ততা, আর্টে যা চারুশীলতা ও অপরিসীম গাম্ভীর্য্য—কুমারী মেরির পোষাকে যা নমনীয় ব্রীড়া ও মাধুর্য্য হ'য়ে ফুটে উঠেছিলো। যেটুকু অস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেলো, মনে হ'ল ছবি যেন এক টুক্‌রো 'সেফায়ার্‌'। হয়তো এইবার এই ঘরের মধ্যে তার আবির্ভাব হ'বে। কিশলয়াকীর্ণ ঘন অরণ্যের মতো এই বুঝি সে মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

নিরুদ্বিগ্ন নিষ্প্রাণ কণ্ঠে অক্ষয়বাবু বল্‌লেন: তাকে জিগগেস

করবার দরকার নেই। উপন্যাস 'কোট্' করে' তোমার এই বিলিতি বক্তৃতার আমি প্রশংসা করতে পারলুম না। কথাটা খোলাখুলি বলে' ফেলে ভালো করেছ—এই জন্যেই যা তোমাকে একটু 'ক্রেডিট্' দিচ্ছি। আমার এ-বিয়েতে একবিন্দু মত নেই—এটুকু জেনে রাখলেই আপাততো তোমার চলবে মনে হচ্ছে।

প্রদোষ সঙ্কোচে দুঃখে এতটুকু হ'য়ে গেলো। চোখের সামনে প্রিয়তম আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটলেও লোকে যেমন ডাক্তারকে শেষ চেষ্টা করবার জন্যে সকাতরে অনুরোধ করে, তেমনি অসহায় মলিন কণ্ঠে প্রদোষ বল্‌লে,—এই কি আপনার শেষ কথা? একটুও ভেবে দেখবেন না?

—ভেবে দেখবার কিছু থাকলে ভেবে দেখতুম বৈ কি!

প্রদোষ বল্‌লে,—তা হ'লে এখন কী করবো?

খোলা দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে অক্ষয়বাবু বললেন: ক্লীন্ আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। তোমাকে অনেক আগে থেকেই এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে বারণ করে' দিয়েছিলাম। তখন শোনো নি, তাই এই অপমান তোমাকে নিতে হ'ল। কিন্তু সত্যি যদি মানুষ হও, এতে তোমার অপকার হ'বে না—

ম্লান হেসে প্রদোষ বল্‌লে,—আপনার এই স্বদেশী বক্তৃতাটুকুও বিশেষ উপাদেয় লাগলো না। কিন্তু আপনার মেয়ের কথাটাও কি একটু চিন্তা করবেন না? সে কি সত্যিই এতে সুখী হ'বে?

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে অক্ষয়বাবু বল্‌লেন,—সুখ-জিনিসটার সত্যিকারের অর্থ জানতে হ'লে কিছু অভিজ্ঞতা চাই। সে-অভিজ্ঞতা ছবির নেই।

—আপনার নিজের অভিজ্ঞতা খাটিয়ে তার সুখ ধার্য্য করতে চান্? এটা কি ভালো হ'বে?

—তার জন্যে তোমার মাথা ঘামাতে হ'বে না। এ নিয়ে বিশেষ মাতামাতি না করে' সোজা পথ দেখ। বলে' অক্ষয়বাবু মাথা গুঁজে চিঠিতে মন দিলেন।

প্রদোষ এক পা দু' পা করে' খানিকটা পিছু হটে' সোজা বেরিয়ে গেলো। এবার নিশ্চয় পর্‌দার অন্তরাল ঠেলে ছবি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে। বহু প্রতিবাদ, বহু অনুনয়, বহু প্রলাপোক্তির পালা। অভিজ্ঞতার বদলে রোমাঞ্চময় অপমৃত্যুর ক্ষুধা! স্থবির সুখ চাই না, চাই উল্লাসময় উচ্ছৃঙ্খলতা। দ্রুতকম্পময়ী বিদ্যুৎ-লতার মতো তার দেহ, ক্ষণস্ফুরণের অসহ্য দীপ্তিতেই তার জীবনানন্দ—তার পরে হোক্ না অগাধ, নিঃশব্দ অন্ধকার। অকাল মৃত্যুতেই প্রেমের অহঙ্কার। এইবার ছবি সেই যৌবনের পক্ষ থেকে, প্রেমের পক্ষ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে আবির্ভূত হ'বে। অক্ষয়বাবু সমস্ত চেতনা শ্রুতিশক্তিতে কেন্দ্রীভূত করে' তার পায়ের শব্দের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্তু পর্‌দা নড়লো না। সাড়ির সেই ক্ষীণ আভাসটুকু কখন্ রূঢ় রৌদ্রে সবুজ শিশিরকণার মতো মিলিয়ে গেছে।

অকাল বসন্ত

*

*　　　*

অক্ষয়বাবু ফের তাঁর বসবার ঘরে নেমে এলেন। বৃষ্টি ঘনিয়ে এসেছে, নিঃসঙ্গতাবোধের নিবিড়তা তাঁর মনে ধীরে-ধীরে পুঞ্জিত হ'তে সুরু করলো। আলো নিভিয়ে অন্ধকারে তিনি চুপ করে' বসে' রইলেন।

না, ছবি নির্জ্জীব ভাবুকতার ধার দিয়েও যায় নি, তার গলার স্বর দস্তুরমতো পরিষ্কার, আচরণ বিগতবৃষ্টি প্রভাতাকাশের মতো পরিচ্ছন্ন, নির্ম্মল—সে ইস্পাতের মতো কঠিন, ঠাণ্ডা। তার জন্যে তাঁর চিন্তা করবার কিছু নেই। উত্তাপের প্রবলতায় যেমন বুদ্বুদ সৃষ্টি হয়, তেমনি যৌবনের আতিশয্যে সে একটু মোহ বিস্তার করেছিলো মাত্র—কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে উত্তাপ বা আবেগের সহনশীলতাই হচ্ছে খাঁটি জিনিস। ছবি তা জানে, তাই পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে নি। তার জন্যে বিলেতে আই-সি-এস্ তৈরি হচ্ছে, প্রদোষ তো নিতান্ত এক কবি!

অক্ষয়বাবু আশ্বস্ত হ'লেন। আশ্বস্ত হ'লেন বটে, কিন্তু মন যেন খুসি হ'ল না। প্রদোষ তাকে সঙ্গে করে' মত নিতে এলো, সে লুকিয়ে পর্দার আড়ালে নিজের ব্যক্তিত্ব লুপ্ত করে' অপরিচয়ের অন্ধকারে আবৃত হ'য়ে রইলো। তার দাম নেই, সার্থকতা নেই, স্বকীয়তা নেই—সহমরণের সেই অত্যুজ্জ্বল উন্মত্ততা

নেই। তারপর প্রদোষকে যখন মুখের ওপর অপমান করে' বিদায় দেওয়া হ'ল, তখনো সে নির্ব্বাক, নিরশ্রু, নির্ব্বিকার। সোজা সে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলো না? গভীরতম উপলব্ধির দৃঢ়তায় মুক্তকণ্ঠে সে বলতে পারলো না: আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো? এই সে ভালবাসে? এরি জন্যে সে নেপথ্যে থেকে প্রদোষকে সম্মুখযুদ্ধে প্রেরিত করেছে? তারপর —প্রদোষের তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গেই এই বৃষ্টিস্নিগ্ধ অন্ধকারের মতো বিরামময় বিস্মৃতি! তারপর—অক্ষয়বাবু আর ভাব্‌তে পারলেন না।

হয়তো শারীরস্পর্শে ছবি প্রদোষের কতো ঘন হ'য়ে এসেছিলো—কতো কথা, কতো সঙ্কেত, কতো ছোটখাটো অর্থহীনতা! রেখায় ও রূপে, আবরণে ও ইসারায়, সান্নিধ্যে ও স্বপ্নে ছবি হয়তো কতো প্রচুর, কতো প্রগল্‌ভ হ'য়ে উঠেছিলো,—তাই আজ প্রদোষের এতো বিশ্বাস, এতো দুঃসাহস, এতো দীপ্তি! সব তার জুড়িয়ে একেবারে ঠাণ্ডা, বিবর্ণ হ'য়ে যাবে! ছবির ভাবনা কী, তার বাবা আছেন, ব্যাঙ্কে টাকা, সমুদ্রপারে লণ্ডন, ভাবী প্রতিষ্ঠাবান স্বামী—সমৃদ্ধি আর সম্মান, সুকোমল বিছানা ও সুস্বাদু খাদ্য। তাই এতে তার কিছু এসে যাবে না, বরং প্রেমের প্রেতচ্ছায়া থেকে সে নিস্তার পেলো। আর প্রদোষেরই বা এমন কী ক্ষতি হ'বে? অবলম্বনহীন দুটি মাত্র বিমর্ষ দিন, নারীজাতির প্রতি অমানুষিক বিতৃষ্ণা; তারপর কুজ্ঝটিকা বিদীর্ণ করে' নির্ম্মম সূর্য্যালোকে তার অত্যুজ্জ্বল

আত্মোদ্‌ঘাটন। এ ভালোই হ'ল। জীবনের সূচনায়ই মেয়েদের এই পরিচয় পেয়ে তার লাভ হ'বে বৈ কি—সে তার সৌভাগ্য, এই ব্যাহত হওয়ার অভিজ্ঞতায় ভবিষ্যতে সে সাবধান হ'তে পারবে—তারা চিরকালই এমনি অগভীর, এমনি পল্লবগ্রাহী, এমনি একঘেয়ে! যে-মেয়ে এমন কাপুরুষ ও কৃত্রিম, সৌখীন বাক্যচ্ছটায় ও কামনাকাতর সান্নিধ্যে যে-মেয়ে উচ্ছ্বসিত হ'তে পেরেছিলো, সে প্রদোষকে একা নির্জ্জন পথে ঠেলে দিয়ে নিজে দিব্যি বিস্মৃতির অতিকোমল গাঢ় অন্ধকারে আত্মগোপন করে' থাকবে ও কালক্রমে অন্য পুরুষের দেহার্থিনী হ'বে—যেখানে প্রেমের প্রয়োজন নেই, নির্লজ্জতম প্রয়োজনের প্রেম—সেই মেয়ের প্রভাব থেকে প্রদোষকে তিনি রক্ষা করলেন। মরুভূমির বাতাসে নিজের সৌরভ অপচয় করবার চাইতে ঢের বড়ো কাজ তার করবার আছে। দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে অক্ষয়বাবু তাকে সেই সঙ্কেত করলেন।

অক্ষয়বাবু অসহায়—প্রদোষকে দরজা দেখানো ছাড়া তাঁর পথ নেই। ছবি সুখ চায়, প্রতিষ্ঠা চায়; সংগ্রাম চায় না, নিয়তস্পন্দনময় ব্যঞ্জনা-ব্যাকুল জীবন চায় না। তার পায়ের মাপে যেমন জুতো, তেমনি জীবনের মাপে সুখকেও তার খাপ খাইয়ে নিতে হ'বে। মেয়ের সুখের জন্যে কী না তিনি করতে পেরেছেন—এ তো সামান্য এক অবাঞ্ছিত প্রেমিককে দরজা দেখিয়ে দেওয়া মাত্র! তাই সে অক্ষয়বাবুর বিরুদ্ধবাদিনী হ'তে সাহস পায় না, পাছে এতো বড়ো আশ্রয় হারিয়ে তাকে পথে বসতে হয়! বাবা যা করবেন, তা

তার ভালোর জন্যেই করবেন—এমন অকপট বিশ্বাস ও বিনতি আজকালকার আইন-অমান্যের যুগে বিরল বলতে হ'বে। তাই সে পর্‌দার আড়ালে অমন মূর্ত্তিমতী বিরতির মতো নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। দৃঢ়, নিষ্কম্প, বলতে হয় বলো,—নিষ্ঠুর। জীবনে সুখ পেতে হ'লে নিষ্ঠুর হ'তে হয় বৈ কি।

প্রদোষকে তিনি বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু মেয়ের এই কুৎসিত স্বার্থপরতাকে মনে-মনে শতমুখে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন। পৃথিবী-ব্যাপী এই বিপুল আয়োজনের সবখানেই অসম্পূর্ণতা—তার মাঝে একমাত্র সুখই কি স্থির, অকৃত্রিম? তার সন্ধানে এই অপরিমিত ধাবমানতার মধ্যে কি নিদারুণ লজ্জা, কুৎসিত ভীরুতা নেই? কিন্তু সে কথা ভাবলে চলবে কেন? ছবি যখন সংসারে সহজ সুখ ও নিশ্চিন্ত আরাম চায়, তখন তাঁকে তা জোগাতেই হ'বে। তিনি তাকে যে এতো দীর্ঘ দিন ধরে' এতো গভীর শিক্ষা দিয়েছেন তা এমন করে' অপচিত হ'তে নয়। স্বাধীনতা যখন তার আছে, তখন অনায়াসেই তা স্বীকার করতে হ'বে।

বুঝলে প্রদোষ, মেয়েমানুষ সব সময়েই আত্মসুখসন্ধানী এবং আত্মসুখের জন্যেই তাদের প্রেম—অন্যকে সুখী বা ধন্য করতে নয়, নিজে কৃতার্থ হ'তে। তোমাকে বলি, বল্‌তে তোমাকে আজ বাধা নেই—আমিও তোমার বয়সে একজনকে ভালোবেসেছিলাম। আমাদের সে-ভালোবাসা তোমাদের ভালোবাসার চেয়ে অনেক তফাৎ ছিলো—মাংসময়ী মূর্ত্তি আর প্রতিমায় যে তফাৎ। আমরা তখনকার দিনে প্রেমপাত্রীকে সন্ধান করতাম না, প্রেমকে আবিষ্কার

করতাম। আমাদের নৈকট্যের মাঝে অনাবরণের এমন প্রখর দীপ্তি থাকতো না, থাকতো রহস্যের গাঢ় আচ্ছন্নতা। প্রকাশে কুণ্ঠিত হ'য়ে অনুভবে আমরা উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌তাম। যতো আমরা বোঝাতে চাইতাম, তার চেয়ে বুঝতাম বেশি। তোমরা আমাদের চেয়ে কতো বেশি অগ্রসর হয়েছ। তুমি নির্ভীক স্পষ্ট কণ্ঠে ছবির প্রতি তোমার ভালোবাসা ঘোষণা করলে, তাকে স্ত্রীরূপে কামিনীরূপে আয়ত্ত করবার জন্যে স্পর্শে ও স্বাদে নিজেকে প্রসারিত করতে পারলে, কিন্তু আমি মুখ ফুটে কোনো দিন যেমন আমার ভালোবাসা উচ্চারণ করতে পারলুম না, তেমনি অধিকারের পরুষ অহঙ্কারে সামান্যতম প্রতিবাদ করবারো প্রবৃত্তি হ'ল না। শুনলে তুমি হাসবে, মুকুলকে যে আমি কোনোদিন স্পর্শ করে' আবিল করি নি, সেই তার চমৎকার দুঃস্পৃশ্যতা তাকে আমার কাছে অশরীরী শিখার মতো উজ্জ্বল করে' ধরলো। মাত্র এই মনে হ'ল যে কবিতার ভাব বাস্তবজগতে স্থায়ী হ'ল না।

তার পর যা হ'ল তা তুমি জানো, বা দু'দিনেই জানবে। দু'-তিন বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হ'তে পারলুম। অন্ধকারে তুমি নিশ্চয়ই এখন দেখতে পাচ্ছ না, উত্তরের দেয়ালে আমার স্ত্রীর এন্‌লার্জড ফটোটা টাঙানো আছে। জীবনে সুখী হয়েছিলাম বৈ কি, —এই বন্ধনের মাঝে, বিশ্রামের মাঝে, সহজ সীমাবদ্ধতার মাঝেই নারীর পরম আত্মবিকাশ ঘটে। পূজা করে' দেবতা পাওয়ার চেয়ে, দেবতা পেয়ে পূজা করাই মেয়েদের পক্ষে সহজ পথ, প্রদোষ। প্রেমিকা পেলুম বটে, কিন্তু প্রেম পেলুম না। তোমাকে বলতে

দোষ নেই, স্ত্রী মারা যাবার পর আমি যে আর বিয়ে করি নি, তার কারণ একপত্নীত্বের আদর্শ নয়, প্রেমহীনতার ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা। তোমাকে আমি সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলছিলুম।

তবে বলতে পারো, আমি বাধা দিতে গেলুম কেন? আমি নিজে বাধা না দিলে হয়তো অবস্থা বাধা দিতো, ঘটনা বাধা দিতো, হয়তো তোমরাই পরস্পরের কাছে বাধা হ'য়ে উঠ্‌তে। ছবির মত আছে বলে' বড়ো বেশি আশান্বিত হ'য়ো না—বলতে কি, সব মেয়েরই মত থাকে, আবার সব মেয়েরই মত থাকে না। মুকুলেরো মত ছিলো—বলতে পারো অতো কথায় সে তা ব্যক্ত করে নি, কিন্তু অতিব্যক্ততার চেয়ে তার সেই অবগাঢ় চেতনাহীনতাই ঢের বেশি মুখর ছিলো। যে-কোনো চেহারায় হোক্ বাধা আস্‌তোই, আমাকে দায়ী করো ক্ষতি নেই, কিন্তু ছবির সত্য পরিচয় তো পেয়ে গেলে। অপ্রত্যাশিত দুঃখের মাঝেই আমরা সত্যিকারের লাভবান হই, সুখের চেয়েও তা বড়ো সুখ, আরামের চেয়েও তা বড়ো আরাম, নিশ্চিত ব্যাধির থেকে প্রত্যক্ষ ত্রাণ পাবার পরম নির্ভাবনা। প্রেমিকার মৃত্যুর চেয়ে প্রেমের মৃত্যু ঢের বেশি কুৎসিত, ঢের বেশি অশ্লীল—আমাদের চেয়ে এতো বেশি অগ্রসর হ'য়ে তা তুমি সহজেই বুঝতে পারবে বৈ কি।

প্রেমের অভিনয়ে ট্র্যাজেডিটাই সুন্দর, স্বাস্থ্যকর—ট্র্যাজেডির যা উপজীব্য তা এ-ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ উদ্‌ঘাটিত হয়। গ্রীকরা ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য কী বলে' নির্ণয় করেছিলো জানো?—kathersis. অর্থাৎ আত্মার শুচীকরণ। এই দুঃখে তুমি বলশালী হ'বে,

দৃষ্টি দৃপ্ত ও প্রেরণা স্পষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী হ'বে। তোমাকে এই আশীর্ব্বাদই করলুম, প্রদোষ। বহুদিন পরে ছবির সঙ্গে যদি তোমার কোনোদিন দেখা হয়, দেখবে আমার আশীর্ব্বাদ ফলেছে কি না। তখন, আমি যদি বাঁচি, আমার কাছে এসো; দু'জনে খানিকক্ষণ খুব হাসা যাবে।

তোমাকে তবে সেই কথাটাও বলি—এখন থেকেই বলে' রাখি। গেলো বছর মুকুলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো, তার এম-বি ছেলের জন্যে ছবিকে সে চায়। সেটা বড়ো কথা নয়, কেননা আমাকে ছেড়ে আমার টাকার প্রতি তার লোভ হয়েছে, তার স্বামী মদে ও আনুষঙ্গিক উপকরণে সমস্ত বাস্তবিষয় ফুঁকে দিয়ে গেছে; তার হৃদয়জোড়া না হ'লেও হাতজোড়া তখন অগাধ শূন্যতা—সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। এও আশীর্ব্বাদ করি প্রদোষ, বিবাহিতা ছবিকে যেন তুমি কোনোদিন না দেখ। বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত তোমার যৌবন অটুট থাকতে পারে, কিন্তু বার্দ্ধক্য নারীর মজ্জাগত, বার্দ্ধক্য তার দ্বিতীয় সত্তা। সেই জন্যেও নয়, যদি দেখ সে জীবনে সুখী হয় নি, এবং ভাগ্যচক্রে তোমারই সাহায্যপ্রার্থিনী—তখন তোমার সেই নিষ্ঠুর কৃপণতা বড়ো বেশি হাস্যাস্পদ, বড়ো বেশি বাস্তব বলে' মনে হ'বে। যাক্, তখনকার কথা তখন—তোমাকে বলে' রাখি, ছবিও কোনোদিন সুখী হ'বে না। প্রকৃতির নিয়মে সামঞ্জস্যের কথা বলছিলে না? এ তাই।

*

*　　　　*

অক্ষয়বাবু চমকে উঠ্‌লেন; দেয়ালের কাছে গিয়ে সুইচ্‌ টেনে দিলেন। আকস্মিক আলোয় পলায়মান অন্ধকার হঠাৎ নীরবে অট্টহাস্য করে' উঠলো। ছবি সুখী হ'বে না কী! তার সুখের জন্যে তিনি অর্থব্যয়ের ত্রুটি করছেন না, যাতে তার রুচি সে বিষয়ে তাঁরো অভিমত অতিমাত্রায় উদার করে' রেখেছেন। না, সে সুখী হ'বে বৈ কি। মেয়েমানুষ কখনো সুখী না হ'য়ে পারে? তানপুরায় যেমন ঝঙ্কার নেই, তেমনি তাদের স্নায়ুতে দুঃখবোধ নেই। নিজের সুখ সে ঠিক বেছে নিতে পারবে।

কিন্তু প্রদোষ মুখ ম্লান করে' রইলো। তিনি যদি তার দুঃখ না বোঝেন, তবে কা'র কাছে সে আশা করতে পারে? অক্ষয়বাবু ফের অস্থির হ'য়ে পাইচারি সুরু করলেন। পৃথিবীতে আজো তবে তিনি আছেন কী করতে—কি আর তাঁর কাজ? প্রদোষের ঐ জ্বলন্ত পূর্ণোচ্ছ্বসিত প্রেমের কাছে ছবির বিলাসী আত্মপরায়ণতার মূল্য কী! কে ছবি? হোক্‌ তার মেয়ে, কিন্তু একান্ত ভঙ্গুর, আত্মসুখসর্ব্ব, মেরুদণ্ডহীন মেয়েই তো সে বটে। তার তুচ্ছ সখের তুলনায় পুরুষের প্রেম কতো ঐশ্বর্য্যশালী! প্রদোষকে বিয়ে করে'ও বা সুখী হ'তে পারবে না কেন?

তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাদেরই তো হস্তগত হ'বে—ছবির অভাববোধের কোথাও এতোটুকু ঘুলঘুলি থাকবে না। পুরুষের প্রথম বঞ্চনার ভয়াবহ দুঃখের বিপুল অসার্থকতা তিনি উপলব্ধি না করবেন তো প্রদোষের আছে কে? কার কাছে তবে সে এসে হাত পেতেছিলো? প্রদোষের সুখের তুলনায় তাঁর মেয়ের সুখের দাম কী!

বৃষ্টি সমানে চলেছে, মুহূর্ত্তগুলি এখনো ঘন, স্বপ্নাচ্ছন্ন। রোদ উঠ্‌বে কাল ভোরে, ছবির নিটোল একটি নিশ্চিন্ত ঘুমের পর। এখনো তার মন অন্ধকারে কোমল, সমস্ত শরীর এখনো হয়তো বিমর্ষ, বিহ্বল। অন্তত আজ রাতটি পর্য্যন্ত ছবি প্রদোষকে ভালোবাসে। কাল্‌কের কথা কাল্‌কে,—অক্ষয়বাবু ইচ্ছা করলে এই মুহূর্ত্তটিকে অবিনশ্বর করে' রাখতে পারেন। এখনো সময় আছে, বৃষ্টি এখনো নিঃশেষ হয় নি। এখনো ছবিকে অনায়াসে তিনি তার এই মুহূর্ত্তের আদর্শের কাছে বলি দিতে পারেন। পৃথিবীতে সুখ অনেক না থাক্‌, প্রলোভন অনেক, কিন্তু প্রেম নেই—অন্তত আজকের এই বৃষ্টিঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন মুহূর্ত্তে ছবি ক্ষণকালের জন্যে দিব্য চোখে প্রেম আবিষ্কার করতে পারে! এখনো সময় আছে।

এই রাত্রি বিদায় হয়ে গেলে সেই রুক্ষ দিন, সেই প্রত্যক্ষ মুক্তি, সেই নিষ্ঠুর বিচার। সেই বিরাট বর্ণহীনতা। এখনো পর্য্যন্ত ছবির চিত্তানুকূল্য আছে, গায়ের সাড়ি এখনো হয়তো সে ছাড়ে নি, শ্রীপতিকে পাঠিয়ে এখনো প্রদোষকে ফিরিয়ে

আনা যেতে পারে। প্রেমের ব্যাপারে কোনো দিক দিয়েই কোনো শেষ কথা নেই—সবখানেই তার আরম্ভ। এখনো সময় আছে। পুরুষের সার্থকতা নারীর আত্মতৃপ্তির ওপর জয়ী হোক্। অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে জয়ী হোক্।

অক্ষয়বাবু কম্পিত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন! ছবি নিজে নেমে না আসুক, তিনিই উপরে উঠে যাবেন। যদি সত্যই সে এখন কাঁদতে বসে' থাকে, তবে তিনি চোখ ভরে' একবার দেখবেন প্রথম প্রেম ব্যর্থ হ'লে মেয়েরা কেমন কাঁদে,—কান্নায় ধুয়ে দৃষ্টি আবার কখন খর রৌদ্রের মতো ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে ওঠে, তা তো তিনি দেখেছেন। সেটা আর আশ্চর্য্য কী! আশ্চর্য্য হচ্ছে, এই অশ্রুধারা, এই ক্ষণিক ব্যর্থতাবোধ, আশ্চর্য্য হচ্ছে বেদনার কাছে এই মধুর আত্মনিবেদন। ছবি না আসুক, তিনি যাবেন—তার এই ব্যর্থতাবোধের আনন্দের মধ্যে তাকে বন্দী করে' রাখ্‌তে। এই চেতনার থেকে তাকে তিনি মুক্তি দেবেন না। কাল্‌কের কথা কাল্‌কে,—ভবিষ্যৎ সব মুহূর্ত্তেই অনধিগম্য, অবাস্তব—আজকেই উপযুক্ত সময়, উপযুক্ত আবহাওয়া।

অক্ষয়বাবু আস্তে-আস্তে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। দেয়ালের উঁচু জান্‌লা দিয়ে জলের ছাট্ এসে সিঁড়ি পিছল করে' দিয়েছে, সিলিঙ থেকে ঝোলানো আলোটা হাওয়ায় দুলে'-দুলে' তাঁর বিকৃত ছায়া ফেল্‌তে ব্যস্ত। কে তা লক্ষ্য করে—অক্ষয়বাবু ছবির ঘরের কাছে উঠে এসেছেন। দরজা তেমনি বন্ধ, কিন্তু তার ফাঁক

দিয়ে শীর্ণ একটি আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। এখন আলো কেন? অক্ষয়বাবুর চোখ যেন শরবিদ্ধ হ'য়ে নিদারুণ যন্ত্রণায় অন্ধ হ'য়ে গেলো। ছবি কি তবে আলো জ্বেলে তার এই ব্যর্থতাকে ব্যঙ্গ করছে? এখন থাকবে ঘন, ঠাণ্ডা, আর্দ্র অন্ধকার—নৈরাশ্যের গভীর নিঃশব্দতা। আলো জ্বেলে এ কী নিষ্ঠুর উপহাস! বুঝলে প্রদোষ, মেয়েরা ভালোবাসতে তো জানেই না, যাকে একদিন ভালোবাসা ভেবেছিলো সেই ভুলের প্রতিও তাদের মমতা নেই।

অক্ষয়বাবু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যে থেকে ছবির হাসি শোনা গেলো। এ কি, মেয়েটা একলা ঘরে পাগল হ'য়ে গেছে নাকি? আপন মনে এ কী সে হাসছে? অক্ষয়বাবুর হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো। আবার হাসি। কিন্তু এ পাগলের হাসি নয়, দস্তুরমতো চিত্তপ্রসাদের পূর্ণ উচ্ছলতা। আলো জ্বেলে এতো খুসি হ'বার যে তার কী কারণ থাকতে পারে ভাবতে গিয়ে অক্ষয়বাবুর মাথা গোলমাল হ'য়ে গেলো। প্রদোষের সে অবমাননার দৃষ্টান্তে তার অহঙ্কারের আর সীমা নেই, পরাজিত প্রেমকে এই বলে' সে সম্বর্দ্ধনা করছে!

দুঃসহ ঘৃণায় অক্ষয়বাবুর সমস্ত শরীর দৃঢ় হ'য়ে উঠ্‌লো। তার জন্যে যার এই তপস্যা, সেই তপোভঙ্গের লজ্জাকে সে করুণায় ও স্নেহে আবৃত করবে না? নিজে নেপথ্যে থেকে পুরুষের এই পরাজয়ে সে গর্ব্ব বোধ করবে? অসহ্য! অক্ষয়বাবু পা দিয়ে দরজায় জোরে ধাক্কা দিলেন।

নিঃশব্দতার সমুদ্রে সেই হাসির তরঙ্গ অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

ঘরময় ভয়ার্ত্ত স্তব্ধতা। আবার ধাক্কা পড়লো—এবার আরো জোরে। ভেতর থেকে ছবি নম্র গলায় জিগ্‌গেস করলো : কে ?

—আমি। কর্কশ গলায়, নিতান্ত ধমকের সুরে অক্ষয়বাবু হেঁকে উঠলেন : খোল্ দরজা।

দরজা তবু খুল্‌লো না। দ্বিধাগ্রস্ত, দোদুল্যমান মুহূর্ত্ত। অক্ষয়বাবু নিষ্ঠুরতর কণ্ঠে আবার ধমকে উঠলেন : কী করছিস দরজা বন্ধ করে' ? খোল্ বল্‌ছি।

আবার সেই মূঢ় নিরুত্তরতা। অক্ষয়বাবু অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লেন। এই মেয়েকে তিনি সহানুভূতি দেখাতে এসেছিলেন, তার চোখে বেদনার অভিষেক দেখতে ?

—কী, ব্যাপারখানা কী ? খুলছিস্ না যে এখনো ?

ছবি অবশেষে দরজা খুলে দিলো। না, সাড়িটা সে এখনো ছাড়ে নি, মেঘের মতো নরম—জায়গায়-জায়গায় অগোছাল, জায়গায়-জায়গায় পুঞ্জ-পুঞ্জ সাড়ি। চুলগুলি বুকে-পিঠে আলুলিত ; না, বেণী বাঁধেনি আজ, ফুলে-ফেঁপে জায়গায়-জায়গায় বিরল, জায়গায়-জায়গায় রাশীকৃত হ'য়ে আছে। প্রসন্ন মুখে হঠাৎ ভয়ের পাণ্ডুরতা ফুট্‌তে কেমন-একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে—সে-মুখে নিঃশব্দ-সঞ্চারী বেদনার ছায়া নেই। চোখে কৌতুক এখনো যেন মেলায় নি, ভয়ের ছোঁয়াচ লেগে কেমন একটু অস্বচ্ছতা ও আহত পশুর দৃষ্টির বিবর্ণতা এসেছে, তাতে এককণা অনুশোচনা নেই। শরীর তার ত্রস্ত, চঞ্চল, নিবেদিকা পূজারিণীর নমনীয়তার চিহ্ন পাওয়া যায় না।

তার মুখের ওপর অক্ষয়বাবু কটুকণ্ঠে ধমকে উঠলেন : এতোক্ষণ কী করছিলি ঘরে বসে'? হাসির ব্যাপারখানা কী?

কোনো কথা না বলে' ছবি আলগোছে দরজা ছেড়ে দিলো

ব্যস্ত হ'য়ে অক্ষয়বাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, ঘরের সবগুলি জান্‌লা খোলা, বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় মেঝেতে নদী বয়ে' যাচ্ছে। খাটটা নিরাপদে একপাশে সরানো, তার ওপর বিছানা নেই, জাজিমের উপর একটা পুরু সতরঞ্চি—কতগুলি তাস ছড়ানো, হাওয়ায় উড়ে কতক মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়েছে। এখানে-ওখানে সদ্য-ছাড়ানো আমের কতগুলি খোসা পড়ে' আছে—ছবি এতোক্ষণ বসে'-বসে' আম খাচ্ছিলো বুঝি। আম খেয়ে এইমাত্র আঁচলে যে সে হাত মুছেছে তার চিহ্ন এখনো স্পষ্ট ধরা আছে অক্ষয়বাবু একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। এই সময়ে এমন বৃষ্টিসিঞ্চিত বিরহঘন মুহূর্তে কোনো মেয়ে নিশ্চিন্তমনে বসে' আম খেতে পারে তা তিনি মরে' গেলেও ধারণা কর্‌তে পারতেন না। এই মেয়ে পুরুষের প্রেমের জগতে রাজত্ব কর্‌বার পরোয়ানা পেয়েছিলো? অক্ষয়বাবু শূন্য চোখে ঘরের দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন। পড়বার টেব্‌লটা আগোছালো, বই-খাতা চারিদিকে ছড়ানো, ক্যালেণ্ডারের দীর্ঘ পৃষ্ঠাগুলি হাওয়ায় উড়ছে, আল্‌না-ভরা সাড়ি-ব্লাউজের রঙিন ভিড়ে স্তূপীকৃত বিশৃঙ্খলা। দেওয়ালের হুক্ থেকে এস্রাজটা নামানো, হয়তো বৃষ্টির সঙ্গে সুর মিলিয়ে সে দিব্যি কয়েকটা গান গেয়েছে এতোক্ষণ। সারা ঘরে খুসি তার ধরে না, বইয়ের উড়ন্ত পাতার

মতো এখানে-ওখানে তা বিকীর্ণ হচ্ছে। ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে যেতে ইম্পিরিয়্যাল এয়ারওয়েইজ্—এঁতেও কম-সে-কম সাতদিন অন্তত সময় লাগে, কিন্তু বিরহের মহাকাশ থেকে নব-পরিণয়-সম্ভাবনার উদ্দীপনায় অবতীর্ণ হ'তে ছবির সাত মিনিটো লাগেনি।

অক্ষয়বাবু বিকৃত মুখভঙ্গী করে' প্রায় চীৎকার করে' উঠ্লেন : —হিহি করে' এতো হাসবার কি হয়েছিলো?

নিতান্ত অপরাধীর মত ছবি ঘাড হেঁট করে' রইলো।

আরো খানিক চুপ করে' থাক্লে অক্ষয়বাবু তার গালে হঠাৎ একটা হয়তো চড় মেরে বসতেন, কিন্তু ঘরের কোণে কোথা থেকে কি একটা অস্ফুট শব্দ হ'তেই তিনি তাড়াতাড়ি চোখ ফেরালেন। মুখ তাঁর সহসা ম্লান, পাংশু হ'য়ে এলো, ঢোঁক গিলতে পারলেন না, নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেছে। ঘরের কোণে আল্মারিটার ধার ঘেঁসে একটা উঁচু-পিঠ-তোলা চেয়ারে জবুথবু হ'য়ে কে একটা লোক বসে' আছে। এই কাণ্ড! এতো দূর! প্রেমিকের বিদায়পরিচ্ছেদের পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায়ই এই নির্লজ্জ অভিসার! প্রেমের অপঘাত মৃত্যুতে তাই তার এই সুখোৎসব! অক্ষয়বাবু মরিয়ার মতো সেই মসীরেখাময় নিস্পন্দ মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করে' চেঁচিয়ে উঠলেন,—কে?

সেই মূর্ত্তি নড়েও না, কথাও কয় না।

অক্ষয়বাবু সেই মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হ'লেন। একেবারে ঠিক পিছনে। তবু তার হুঁস নেই। অক্ষয়বাবুর ইচ্ছা হ'ল

তার ঝাঁকড়া চুলগুলি মুঠিতে চেপে ধরে' টেনে ঘাড়টা এদিকে ফিরিয়ে তার মূর্চ্ছা ভেঙে দেন। কোথায় সে পালাবে?

কিন্তু গায়ে হাত তুলবার আগে তিনি আর একবার চেঁচিয়ে উঠলেন,—কে এখানে বসে?

লোকটা তেমনি উদাসীন; আত্মরক্ষার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা নেই, সম্মান বাঁচাবার জন্যে নিজের ব্যবহারের স্বপক্ষে কোন ব্যাখ্যার প্রয়াস নেই। অক্ষয়বাবু আশ্চর্য্য হ'য়ে তার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে ফের শুধোলেন: তুমি কে?

মূর্ত্তি উত্তর দিলো: আমি প্রদোষ।

—প্রদোষ? মুহূর্ত্তে ঘরের স্থির অনড় আবহাওয়াটা চঞ্চল বাতাসে ও বাহিতবৃষ্টিকণায় মেদুর, মৃদু-মৃদু রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্লো। অক্ষয়বাবু গলায় খানিকক্ষণ কথা পেলেন না; নিজেকে সম্বৃত করে' স্নিগ্ধস্বরে জিগ্গেস করলেন: কী করছ বসে' এখানে?

প্রদোষ প্রসন্ন গলায় বল্‌লে,—আম খাচ্ছি।

—আম খাচ্ছ? অক্ষয়বাবু হেসে উঠ্‌লেন: কেটে প্লেটে করে' নয় যে। ওঠো, ওঠো, পোস্তা থেকে তিন ঝুড়ি আম এসেছে আজ। ভাগ্য ভালো—সব ঝুড়িই ফার্ষ্ট-রেইট্।

প্রদোষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। যেন বিস্মিত হবার কিছু নেই এমনি সহজ গলায় সে বল্‌লে,—অনেক খেয়েছি। দেখছেন না কতো আঁঠি।

অক্ষয়বাবু বল্‌লেন,—তখন তুমি আর বাড়ি যাওনি?

নির্লিপ্তের মতো কোঁচার খুঁটেই হাত মুছ্‌তে-মুছ্‌তে প্রদোষ বল্‌লে,—কী করে' যাই বলুন—এমন বিশ্রী বৃষ্টি করে' এলো।

—তা বেশ করেছ। আজকে বাড়ি গিয়ে আর কাজ নেই—আমি শ্রীপতিকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখেনেই আজ থাকো। কোনো অসুবিধে হ'বে না তো?

প্রদোষ এবার মূঢ়ের মতো অক্ষয়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

অক্ষয়বাবু ছবিকে বল্‌লেন,—মাঝের ঘরে শ্রীপতিকে দিয়ে তোলা খাট্‌টা ফিট্‌ করে' প্রদোষের জন্যে বিছানা করে' রাখ্‌। শ্রীপতি একা না পারে, যেখানে থেকে পারুক্‌, একটা মিস্ত্রি ডেকে আনুক্‌। তারপর প্রদোষের দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—আজ রাতটা ভালো করে' ঘুমাও।

ফের বল্‌লেন,—ঠাকুরটা কী রাঁধছে এ-বেলা? বৃষ্টিতে কী ভালোবাসো খেতে? খিচুড়ির সঙ্গে ডিমের বড়া? যা ছবি, ঠাকুরকে ডালে-চালে চাপাতে বল্‌ গিয়ে। ও! খোট্টাটা বুঝি আবার ডিম ছোঁয় না। তবে তুইই ষ্টোভ্‌ ধরিয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা কর্‌, যা। দেখিস্‌ সাবধান, আঁচল সাম্‌লে। শ্রীপতিকেই বল্‌, ধরিয়ে দেবে।

প্রদোষ হেসে বল্‌লে,—আমিই পারবো। কোথায় ষ্টোভ?

—না, না, তুমি কেন? শ্রীপতিই তো আছে! তা এখনো রাত বেশি হয় নি। আর কতোক্ষণ পরে করলেও চলবে। জান্‌লাগুলি বন্ধ করে' দে, ছবি। নতুন বৃষ্টি, চট্‌ করে' ঠাণ্ডা

লেগে যেতে পারে। এ কী, তোমরা দু'জনে যে একেবারে ভিজে গেছ? জান্‌লায় দাঁড়িয়ে ছিলে বুঝি?

অক্ষয়বাবু দরজার দিকে অগ্রসর হ'লেন। যেতে-যেতে বল্‌লেন: আম যতোটা পারো খাও, আর জামা-কাপড়গুলো বদলে ফ্যাল্, ছবি। আমার দেরাজ থেকে প্রদোষকে শুকনো একছুট্ কাপড় বা'র করে' দে। শিগ্‌গির। দেখি রান্নার কদ্দূর কী হ'ল? শ্রীপতিকে মিস্ত্রি ডাকতে পাঠিয়ে দি। ডিম ঘরে আছে কি না তাই বা কে জানে। বল্‌তে-বল্‌তে তিনি অদৃশ্য হ'লেন।

খানিকক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাস স্তব্ধতা, পরে যুগলকণ্ঠে সবল স্বচ্ছ হাসি বৃষ্টিপাতের মতো অনর্গল উৎসারিত হ'য়ে উঠলো। ঘরময় বিকীর্ণ হ'তে লাগলো। দেয়ালে ঠিক্‌রে-ঠিক্‌রে ভেঙে-ভেঙে পড়লো।

*

*　　　　*

অক্ষয়বাবু তাঁর বসবার ঘরে ফিরে এলেন।

সংশয়, তবুও তাঁর সংশয় ঘোচে নি। সুখ নেই, প্রদোষ ও ছবির গাঢ়তম মিলনের পরিপার্শ্বেও সুখ নেই। সাহস আছে, সংগ্রাম আছে, কিন্তু সুখ নেই। তবে তা কী! ক্লান্তি,

ঔদাসীন্য, অবহেলা? উত্তাপহীনতা? পুনরাবৃত্তি? অক্ষয়বাবু অস্থির-পায়ে পাইচারি করতে লাগলেন।

তবু কালকের কথা কাল্‌কে। আজকের এই মুহূর্ত্তটি নতুন, সদ্যসূর্য্যোদয়ের মতো পরিচ্ছন্ন। এবং এই তো প্রেম।

যৌবন

বিবাহ-পর্ব্বটা কোনোরকমে সমাধা হইল। হাতে যদি কখনো কোনো সম্পত্তি, আসে, সেই ভরসায়ই ভবিষ্যৎ বংশধরদের মুখ চাহিয়া লৌকিক অনুষ্ঠান একটা পালন করিলাম। নচেৎ আমি করুণাকে ভালোবাসি ও করুণা আমাকে কামনা করে—ইহার চেয়ে সত্য ও স্বাভাবিক কোনো সম্পর্ক আর কোথাও কিছু থাকিতে পারে বলিয়া ভাবিতে পারিতাম না। চুক্তিপত্রে তবুও সাক্ষী-সাবুদের সঙ্গে আমাদের নাম দুইটা দস্তখত করিয়া দিলাম। সমাজকে না মানিলেও আইনকে অমান্য করিতে আমার পচ্ছন্দ হয় না।

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া বাহির হইয়া দেখিলাম সমস্ত আকাশ সাদা হইয়া গেছে। অতো বড়ো আকাশের নিচে আমি ও করুণা ছাড়া ধারে-কাছে আর একটিও প্রাণী কোথাও চোখে পড়িল না। সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া উগ্র ও উলঙ্গ মুক্তির মাঝে দুইজন অবতীর্ণ হইয়াছি।

করুণাকে আজ আত্মার অশরীরী আকাশ হইতে ছিনাইয়া আনিয়া দেহের পিঞ্জরে বন্দী করিয়াছি বলিয়া গোড়াকার পরিচ্ছেদগুলি উল্টাইয়া দেখিতে আর ইচ্ছা করে না, সে এখন এতো প্রত্যক্ষ,এতো সন্নিহিত ও এতো স্পর্শ-ভঙ্গুর যে কাছে রাখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাকে অণুবীক্ষণ করা ছাড়া আর কোনো কাজে আমার মন বসিতেছে না। সে আর এখন ভাবময় রূপ নয়, লীলায়িত রেখা—সে আর সঙ্কেত নয়, সহজ ও স্থির একটা সিদ্ধান্ত। দীর্ঘ সাত বৎসর মেঘলোকে সঞ্চরণ করিয়া

এখন নরম, ঠাণ্ডা, নতুন মাটিতে নামিয়া আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছি। যেন উত্তাল নদীতে নতুন চর পড়িয়াছে।

হাতে একটা মোটা চাকুরি আছে, দেহে আছে স্বাস্থ্য, হৃদয়ে সুতীব্র প্রলোভনের সঙ্গে উত্তপ্ত প্রেম, স্পৃহার সঙ্গে ভোগ—আর করুণার আছে সেই অমিত শক্তির কাছে প্রবল প্রচুর সমর্পণ—সমাজকে আমরা ভয় করিব কিসের ভয়ে? দরজা যদি সে বন্ধ করিয়া দেয়, আমাদের স্থানের পরিধি আরও বেশি বাড়িয়া গেছে মাত্র; আমরা এত অপরিমিত শক্তিধর যে আমাদের প্রাণবেগকে সে রুদ্ধ করিতে পারিল না। করুণাকে লইয়া অসীম নির্জ্জনতার মধ্যে নামিয়া আসিলাম,—সেখানে তাহার আকাশ ও আমি ছাড়া আর কেহই রহিল না।

আমার কবিত্ব এত জলীয় নয় যে নিরাবরণ নৈকট্যের মধ্যে পাইয়া করুণাকে আমার বিস্বাদ লাগিবে, বরং তাহার সৌন্দর্য্য এত নিষ্ঠুর ও নিদারুণ মনে হইল যে স্বপ্নের চেয়ে সত্যকেই বেশি রোমাঞ্চময়, বেশি রমণীয় বলিয়া বিশ্বাস করিলাম। একটি মুহূর্ত্তও আর ম্লান রহিল না।

কিন্তু জাঁক করিয়া এত কথা এখনই বলিবার কী হইয়াছে! করুণাকে কাছে পাইয়াছি তো মোটে সাত দিন।

একটু গুছাইয়া নিতে সাত দিন সময় লাগিল বৈ কি! কোথায় এখন বেড়াইতে যাওয়া যায় দুইজনে তাহাই পরামর্শ করিতে বসিলাম।

গরম পড়িয়া গেছে—দার্জ্জিলিঙটাই চোখের সামনে ঝিক্‌মিক্

করিতেছিল। কিন্তু করুণার সবতাতেই অভিনব মৌলিকতা আছে—চিন্তার এই চমৎকারিতাই তাহার চরিত্রের বিশেষ একটা গুণ। মাথা নাড়িয়া বলিল,—দার্জ্জিলিঙ নয়, চলো পিসেমশাইর কাছে যাই।

অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—সে কোথায়?

সে পূর্ব্ববঙ্গের একটা অখ্যাত গ্রাম—পদ্মা ও মেঘনা যেখানে মিশিয়াছে ঠিক তাহারই কাছ-বরাবর। পিসেমশাই বুড়ো মানুষ, যৌবনে স্ত্রী মারা যাইবার পর সহর ছাড়িয়া সেইখানেই একেলা রহিয়া গেছেন; লোকজন লাগাইয়া কিছু জোত-জমি ক্ষেত-খামার করিয়াছেন,তাহাই তদারক করেন—সংসারে আপনার বলিতে বৃহৎ একটি সেতার ছাড়া কিছুই নাই—সেইখানেই করুণা আমাকে লইয়া যাইবে। আমাদের দেখিয়া নিশ্চয়ই তিনি খুব খুসি হইবেন ও হাতে যখন আমার লম্বা ছুটি আছে, তখন কিছুকাল না-হয় সেইখানেই স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া আসা যাইবে।

কথাটা নতুন একটা নেশার মত আমাকে আচ্ছন্ন করিল। করুণা চিরকাল রাজধানীতেই মানুষ হইহয়াছে, তাহার উজ্জ্বল, মুখর, সদা-ব্যস্ত জীবন-যাত্রায়ই সে অভ্যস্ত। সে এই কলিকাতাকে আমারই মতন ভালোবাসে, তাহার রাস্তা ও আলো, তাহার ধূলা ও শব্দ, তাহার অধিবাসীদের বিচিত্র কোলাহল! দোকান, ষ্টল্, জান্‌লায় রঙিন আলো, স্বপ্নাতীত মূল্যের জিনিস-পত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ! সে ভালোবাসে

পোষাকের তাপ ও গন্ধ, আহারের স্বাদ ও আবহাওয়া, চলিবার অনিবার একটি ছন্দোহীনতা! বিবাহের দুই দিন পর তাহাকে নিয়া ফির্‌পোর রেষ্টোর‍্যাণ্ট হইতে যখন ট্যাক্সি করিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম, তখন সে এক হাতে আমার হাতের উপর তালি দিয়া কহিয়াছিল: কী চমৎকার এই জীবন, আর কী চমৎকার এই কল্‌কাতা! এতো এখানে পাবার, এতো দেখবার! আমার সব এমন ভালো লাগে! খেতে, সাড়ি পরতে, ঘুরে-ঘুরে দোকান দেখতে, জিনিস কিনতে, রাত করে' বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে তোমার পাশে এসে শুতে! পড়বার এতো বই, শোনবার এতো শব্দ! কতো লোকের সঙ্গে দেখা, কতো রকম আলাপ! তোমারো খুব ভালো লাগে না?

সেই করুণা হঠাৎ গ্রামের প্রতি—তাহার পারহীন স্তব্ধতা ও আলস্যের প্রতি এমন পক্ষপাতী হইয়া উঠিল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কিন্তু তাহাকে দমাইতে চেষ্টা করা বৃথা। কথাটা তাই ঘুরাইয়া বলিলাম,—কিন্তু তোমার পিসেমশাই যে যুগল-মূর্ত্তি দেখে ওঁ বলে' আরাধনা সুরু করবেন এ তুমি ভাব্‌ছ কেন?

করুণা তাহার দুই চক্ষু উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত করিয়া কহিল,—অনায়াসে ভাব্‌ছি। পিসেমশাই দাদা-কাকাদের মতো অমন কাঠখোট্টা, একগুঁয়ে নয়। বাইশ বছরে বৌ হারিয়ে সারা জীবনে যে আর বিয়ে করেনি, সে আর যাই হোক্ প্রেমকে অমর্য্যাদা করবে না।

কথাটা করুণা এমন জোর দিয়া বলিল যে তাহার যুক্তিটা যাচাই করিয়া দেখিবার সময় হইল না। বলিলাম,—সেখানে গেলে দু' দিনেই তুমি হাঁপিয়ে উঠ্‌বে।

—মোটেই নয়। করুণা সোফায় গা এলাইয়া হাঁটুর উপর পা তুলিয়া বসিয়াছিল, এবার কথার প্রাবল্যে উঠিয়া পড়িল। বসন্তের বাতাসে বনের নতুন পাতার ঘন শিহরণের মতো তাহার গা ভরিয়া পাতলা সিল্ক ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল। কহিল,—সেখানে আমার খুব ভালো লাগবে দেখো। দার্জ্জিলিঙে যারা যাবে তারা এখনো ভাবুকতার স্তরে বসে' ঝিমুচ্ছে আর স্বপ্ন দেখছে। আমরা এখন পরস্পরের কাছে এতো গভীর হ'য়েও এতো পরিচিত যে প্রকৃতিকে আর আমরা ভয় করি না। আর আমাদের আয়োজন বা উপকরণের দরকার নেই—এই অবকাশটিই দেখো আমাদের কতো ভালো লাগবে।

করুণা কী সুন্দর করিয়া কথা কয়! আমি উহার কথাগুলির স্পষ্ট ঘ্রাণ পাই, মুঠি ভরিয়া স্পষ্ট স্পর্শ করিতে পারি। উহার কথাগুলি লীলায়িত ভঙ্গিতে আমার চোখের সামনে নাচিতে থাকে।

আমি আরেকটা কৌচে একটু দূরে বসিয়াছিলাম, আমার দিকে আগাইয়া আসিতে-আসিতে আবার কহিল,—কলকাতার রাস্তায় শব্দ ও রঙ যেমন ভালো লাগে, তার চেয়েও ভালো লাগবে আমার নদীর ঢেউ আর ফেনা। বলিয়া সে আমার কোলের উপর বসিয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিল। কহিল,

—তারপর সন্ধ্যায় নৌকা করে' বেড়াবো—অন্ধকার কালো নদীর ওপর,—ভাবতে পারো একবার? বলিয়া সুখে অস্থির হইয়া আমার মুখের উপর চুমা খাইতে লাগিল।

কথাটা না বলিয়া পারিলাম না—আমার মনে হইল রূপালি নদীর জলে আমি যেন সাঁতার দিতেছি।

তাহার পর গালের উপর গাল রাখিয়া ঈষৎ কাৎ হইয়া করুণা কহিল,—চলো, আজই তা'লে বেরিয়ে পড়ি। ওঠো তবে এখুনি। কিছু জিনিস-পত্র কিনে—ধরো একটা ক্যামেরা, টর্চ, ফ্লাস্ক্,—ষ্টেশনে গিয়ে ঢাকা-মেইলে দু'টো লোয়ার্-বার্থ রিজার্ভ করে' আসি। আজই—মাথায় যখন একবার এসেছে, আর দেরি নয়। প্রলোভন দেখে 'না' বলাটা অতি সহজ —একটা কাপুরুষেও তা বলতে পারে। ওঠো, ওঠো—পিসেমশাইকে এখুনি গিয়ে একটা টেলি করে' দিতে হবে—নইলে, রাজ্যছাড়া দেশ,—হয় তো আমাদের যাবার আগে আর পৌঁছুবে না। ওঠো।

বলিয়া সে উঠিয়া পড়িতেছিল, তাহাকে দুই হাতে নিবিড় করিয়া কোলের উপর বাঁধিয়া রাখিলাম।

নিঃশব্দ রাত্রিকালে নদীর তরল কলধ্বনির মতো সে হাসিয়া উঠিল: এখন নয়, ট্রেনে। পৃথিবীটা যে চলেছে এখানে বসে' থেকে এমনি মোটেই মনে হয় না। তাই ট্রেনে—যখন সত্যি-সত্যিই আমরা যাচ্ছি। বলিয়া করুণা সারা শরীরে সিল্ক্এর কোমল একটা ঝড় তুলিয়া উঠিয়া পড়িল।

*

*　　　*

ট্রেনের রাতটা ব্যক্তিগত কথায় ও আচরণে কোনোরকমে কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু ভোরবেলা নারায়ণগঞ্জের ষ্টিমারে চাপিয়া করুণা একেবারে ষ্টিমারের চাকার কাছে নদীর ঢেউর মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একসঙ্গে এতো সাদা জল, এতো সবুজ মাঠ ও আকাশময় এমন নীল নির্মেঘতা জীবনে আর সে কোনোদিন দেখে নাই। হাওয়ায়-উড়ানো সাদা সিল্ক্‌এর রুমালের মতো ঝাঁক বাঁধিয়া গাঙশালিক উড়িয়া যায়, ষ্টিমারের যাত্রীদের দিকে চাহিয়া পারে দাঁড়াইয়া আদুল-গায়ে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা মুখ ভেঙচায়, ঢিল ছোঁড়ে, কখনো বা আয়-আয় বলিয়া ষ্টীমারটাকে হাতছানি দিয়া ডাকে, ঢেউর বাড়ি খাইয়া জেলে-ডিঙিগুলি জলের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া নিমেষে আবার মাথা তুলিয়া ভাসে আবার ডোবে, স্তূপীকৃত কচুরি-পানায় সবুজ মখ্‌মলের পুরু বিছানা কে বিছাইয়া রাখিয়াছে, কখনো বা কত দূরে আসিয়া নদীটা অপরিমিত শুভ্র হইয়া উঠে, পার বা সীমা দেখা যায় না,—আর করুণা ভয়ে, বিস্ময়ে, আনন্দে, শব্দ করিয়া, হাততালি দিয়া, গান গাহিয়া, নাচিয়া, লাফাইয়া আমাকে ও চারপাশের কৌতূহলী যাত্রীদের একসঙ্গে উদ্ব্যস্ত ও অভিভূত করিয়া ফেলে।

তারপর দুপুরবেলা ষ্টিমার-ঘাটে নামিয়া যখন নৌকা করিলাম,

তখন করুণাকে আর দেখে কে! খেল্‌না পাইয়া ছোট খুকিটির মতো খুসিতে অস্থির হইয়া উঠিল। কখনো নৌকার পাটাতনের উপর দাঁড়াইয়া বড়ো-বড়ো চোখ মেলিয়া চারিদিকে চাহিতে থাকে, বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে পারে না, টাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া কাঁপিয়া পড়ে, কখনো বা আমার হাত ধরিয়া টলিতে-টলিতে ভয়ে-ভয়ে ছইয়ের উপর উঠিয়া আসে, রোদ্দুর গ্রাহ্য করে না, কখনো বা বেলা পড়িয়া আসিলে নদীতে পা ডুবাইয়া বসিয়া ছলাৎ-ছল করিয়া জল ছিটায়।

ঘাটে আসিয়া যখন নৌকা লাগিল, সন্ধ্যা হইতে তখনো বেশ বাকি আছে। পারে একবুক সাদা দাড়ি লইয়া যে বৃদ্ধটি নিকটায়মান নৌকোটার দিকে এতক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, করুণা খুসি হইয়া কহিল, তিনিই আমাদের পিসেমশাই। নৌকাটা ভিড়িতেই করুণা একলাফে পারে নামিয়া পড়িয়া পিসেমশাইকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, খানিকক্ষণ কিছু কথা কহিতে পারিলেন না। আস্তে-আস্তে আমিও আগাইয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলি মাথায় নিলাম। এমন সৌম্য গম্ভীর প্রশান্ত অবয়ব ও দৃষ্টির আকর্ষণে কে না বশীভূত হইবে? তিনি সহসা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন,—ইনি কে, করু?

করুণা লজ্জায় ঈষৎ রাঙা হইয়া অথচ লজ্জা দেখাইবে না বলিয়া প্রচুর হাসিয়া কহিল,—তোমার জামাই।

—জামাই? তোকে চুরি করে' নিয়ে পালাচ্ছিলো? বড়ো জোর ধরে ফেলেছি ত'? বলিয়া প্রায় ধৃতরাষ্ট্রের প্রবল সন্তানস্নেহে

আমাকে বুকের উপর ঠিক আলিঙ্গন নয়—নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—কবে এই কাণ্ডটা করলি শুনি?

করুণা কহিল,—এই দিন সাতেক আগে।

তাহার গাল বাড়াইয়া একটা চড় মারিতে উদ্যত হইয়া পিসেমশাই কহিলেন,—দিন সাতেক আগে, আমাকে তবু খবর দিসনি হতভাগি?

গালটা সরাইয়া করুণা কহিল,—কাউকে কিছু খরব দেবার অবস্থা মোটেই ছিলো না যে।

—কেন? ব্যাপারখানা কী? বলিয়া পিসেমশাই আমার মুখের দিকে চাহিলেন।

আমার হইয়া করুণাই কহিল, সুন্দর করিয়া সে-ই কথা কহিতে জানে: আমরা যে ঠিক গণ-গোত্র জাত-জন্ম মিলিয়ে বিয়ে করিনি, পিসেমশাই। আমরা যে ভালোবাসি—বিয়ের ঠিক পরে থেকে না-হ'য়ে কয়েক বছর আগে থেকেই। এই অপরাধে বাবা-জেঠা কাকা-দাদা সবাই আমাদের ত্যাগ করলেন—খবর আর কাকে দেব? কোনো রকমে কাজ সেরে তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি।

উত্তরে পিসেমশাই কী বলেন দেখিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলাম। শ্মশ্রুমণ্ডিত প্রশান্ত মুখ আনন্দে ও গৌরবে সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল। অন্য হাতে করুণাকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি কহিলেন,—ভালোবাসার আবার জাত-জন্ম কী? খুব করেছিস্, বেশ করেছিস্—এই তো চাই। তোরা না হ'লে

সমাজকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে কে? বলিয়া আমার কাঁধে প্রবল ঝাকানি দিয়া কহিলেন,—সাবাস্ বাবাজি, জীতা রহো! তোমাদের দেখে কী যে খুসি হ'লাম বাবা—এই দেখবার জন্যেই হয় তো এখনো বেঁচে আছি। কিন্তু সুরেন-শালার হঠাৎ এমন মানসিক অধোগতি হ'ল কী করে? ও না শুন্‌ছি নিদারুণ সন্নেসি হয়েছে?

আমার শ্বশুরকেও যে কেহ শালা বলিতে পারে ইহা ভাবিয়া ভীষণ খুসি হইলাম। কহিলাম,—যতো বেশি সন্নেসি হচ্ছেন, ততো বেশি হিন্দু হচ্ছেন যে।

—রেখে দাও,—ওর ভণ্ডামির কথা আর জানিনে আমি? ভালোবাসি, একে-অন্যেকে বিয়ে করতে চাই, বিয়ে করে' সুখী হ'ব বিশ্বাস হয়—এর চেয়ে সহজ আর কিছু হ'তে পারে নাকি পৃথিবীতে? কিন্তু আর এখানে দাঁড়িয়ে নয়, নিশ্চয়ই তোমাদের খুব খিদে পেয়েছে। চলো, চলো, পাল্কি তৈরি—এই জহর, মোটঘাটগুলো মাথায় তুলে নে।

করুণা কহিল,—পাল্কি, পাল্কি কী হ'বে, পিসেমশাই?

—বাড়ি যে এখান থেকে ক্রোশ দুয়েক পথ। নে, ওঠ, আর দেরি নয়। এই গণপতি—বলিয়া তিনি বেয়ারাদের ডাক দিলেন: ফাঁক পেলেই যে খালি ফুড়ুক্-ফুড়ুক করবি—দেব ভেঙে তোদের হুঁকো। বলিয়া তিনি মাটি হইতে মোটা লাঠি গাছটা তুলিয়া লইলেন। কহিলেন,—ওঠ্ ব্যাটারা, কাঁধ দে শিগগির। লণ্ঠনে তেল ভরেছিস তো রে জহর?

করুণা আপত্তি করিল: মাইল চারেক তো মোটে, স্বচ্ছন্দে হেঁটে যেতে পারুবো। পাল্কি-ফাল্কি কেন, হেঁটে যেতেই খুব ভালো লাগবে।

—না না, পথ-ঘাট সুবিধের নয়, পাট-ক্ষেত, কাঁটা-বন, অনেক কিছু মাড়িয়ে যেতে হ'বে। একটা খাঁড়িও পেরোতে হ'বে—তার একহাঁটু জল, নে, ওঠ্।

করুণার আপত্তি আর টিঁকিল না, দেহটাকে সঙ্কীর্ণতর করিয়া ঘাড়-হেঁট হইয়া পাল্কিতে গিয়া উঠিতে হইল। পিসেমশাই আমাকে কহিলেন,—তুমিও উঠে পড়ো, বাবাজি।

কহিলাম,—আমি উঠবো কী! আপনি বুড়ো মানুষ, আপনিই উঠে বসুন। আমি দিব্যি হেঁটে যেতে পারবো।

পিসেমশাই লাঠি লইয়া আমাকে তাড়িয়া আসিলেন: জামাই হ'য়ে উনি দিব্যি হেঁটে যাবেন? ওঠো। পরে কানের কাছে মুখ আনিয়া চাপা গলায় কহিলেন,—ট্রেনে-ষ্টিমারে পাল্কির মতো প্রেম জমে না, বাবাজি—সেখানে অনেক যাত্রী, অনেক জায়গা। গায়ে গা না লাগিয়ে এখানে বসতে যাওয়াই বিপদ—বুঝলে, এমন সুবিধে আর পাবে না।

তাঁহার কথা বলার ধরণ দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম; কহিলাম,—কিন্তু আপনার ভারি কষ্ট হ'বে যে।

পিসেমশাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সহসা জহরকে সাক্ষী মানিয়া বসিলেন: শোন্ জহর, আমার দিব্যি-হাঁট্‌নে-ওয়ালা জামাই-বাবাজি কী বলছেন? আমার নাকি কষ্ট হ'বে!

বয়েস না-হয় আমার এখন ছেষট্টিই হ'লো, কিন্তু জানো বাবাজি, একহাতে কুপিয়ে এখনো গাছ ফাড়তে পারি, নৌকো বাইতে পারি, গোটা দুয়েক ইলিশ মাছ একা বেমালুম হজম করে' ফেলতে পারি—বেয়ারাদের কেউ হাঁপালে শেষকালে আমি গিয়েই ত' কাঁধ বদলাবো। বলিয়া তিনি আমার ঘাড় ধরিয়া পাল্কির দুয়ারের কাছে লইয়া আসিলেন।

অগত্যা আমাকেও কোঁচা সামলাইয়া ঘাড় হেঁট করিতে হইল।

পিসেমশাই ভিতরে উঁকি মারিয়া কহিলেন,—আর কতো পা গুটোবি করু, গায়ে গা একটু লাগবেই। আমি ত' দূরে-দূরেই থাকবো, দেখতে আসবো না। তবে আর অতো ভয় কিসের? বলিয়া তিনি হাসিমুখে দরজা দুইটা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

পাল্কি চলিল। আমি আর করুণা জীবনে এতো মুখোমুখি হইয়া কোনোদিন বসি নাই। এই প্রকাণ্ড পৃথিবী হইতে এই এতটুকু জায়গা পিসেমশাই আমাদের জন্য ঘেরিয়া দিয়াছেন, বাহিরের আর-সব যেন লুপ্ত হইয়া গেছে।

দরজা ফাঁক করিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিলাম। বিকালের আলোটুকু পড়ি-পড়ি করিতেছে। দেখিলাম পাল্কির সঙ্গে-সঙ্গে দ্রুত পায়ে লাঠি-হাতে পিসেমশাইও ঝোপ-ঝাড় মাড়াইয়া আগাইয়া চলিয়াছেন। দীর্ঘ সরল চেহারা, লাঠি ধরিবার ভঙ্গিটাতে কঠিন তেজ, বার্দ্ধক্যে ও উদারতায় দৃষ্টি কী

প্রশান্ত! করুণাকে যে আমি কতো ভালোবাসি তাহা এতদিনে এই পিসেমশাইকে দেখিয়া বুঝিলাম।

*

* *

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে বাড়ি পৌঁছিলাম। গাছ-পালা দিয়া ঘেরা বাঁশের বেড়া-দেওয়া খড়ের একখানি মাত্র ঘর, ছোট একটুখানি উঠোন—ওপারে গোয়াল-ঘরে গোটা দশ-বারো গাই-বলদ। সমস্ত ছবিটি কী যে স্নিগ্ধ লাগিল, অনুভূতিগুলি এমন সূক্ষ্ম ও কোমল হইয়া আসিল যে নিজেদের যেন চট্ করিয়া চিনিতে পারিলাম না।

কত রাজ্যের খাবারই যে পিসেমশাই জোগাড় করিয়া আনিয়াছেন। বলিলেন,—হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়েছ তো বাবাজি, টপাটপ্ সাবাড় করে' ফেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—রাত্রের খাবার এখুনিই সেরে ফেলতে বলছেন নাকি?

—রাতের খাবার মানে? তোমাদের ঐ সব সহুরে রসিকতা-গুলো রাখো। হাঁ করো শিগগির, নইলে জোর করে' গেলাবো কিন্তু।

পাশেই তালপাতার ছাউনি-দেওয়া ছোট একখানা আটচালায় পিসেমশাইর রান্না হয়। হঠাৎ দেখি তিনি নিজেই উনুন-কাঠ,

হাঁড়ি-কুঁড়ি লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। করুণা ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—এ কী হচ্ছে, পিসেমশাই ?

—বা, রাঁধতে হ'বে না ? না, সারা রাতই তোরা উপোস করে' থাক্‌বি ? ওরে জহর, মাছটা তোর কাটা হ'ল ?

করুণা কহিল,—খেয়েছি ত' এক পেট, তবু বুঝ্‌লুম রাতেও না-হয় আবার খেতে হ'বে, কিন্তু তুমি রাঁধ্‌ছ কী! উনুনের কাছ থেকে উঠে এসো বলছি, ওঠো। আমি আছি কী করতে ?

করুণার মুখের দিকে চাহিয়া পিসেমশাই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন: শিগগির এখান থেকে পালা উনুনমুখি, নইলে চেলাকাঠ নিয়ে তাড়া করব বলছি। উনি রেঁধে খাওয়াবেন! হাত-পা পুড়িয়ে সাড়িময় আগুন ধরিয়ে একটা লঙ্কাকাণ্ড করুন, খুব ঠেসে খাওয়া হবে'খন। দ্যাখ্‌ না, এই বুড়ো পিসেমশায়ের হাতে রান্নাটা তোরা খেয়েই দ্যাখ্‌ না একবার, কলকাতার বাড়িতে আমাকে তোদের বাবুর্চি রাখতে পারিস্‌ কি না। এই যে বাবাজি এসেছ, কিন্তু ধোঁয়ায় আর দাঁড়িয়ে কেন, তোমরা দু'টিতে মিলে ঐ মাঠে একটু বেড়িয়ে এসো না, মাঠ-ঘাট জ্যোৎস্নায় কেমন ফট্‌-ফট্‌ করছে।

করুণা আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—পিসেমশাই কিছুতেই আমাকে রাঁধতে দেবেন না। এতো রাজ্যের জিনিস নিয়ে বসে' দুটো উনুন ধরিয়ে সব তিনি একাই নামাবেন বলছেন।

—হ্যাঁ, নামাবোই তো। ঘণ্টা দুয়েক মোটে লাগবে। তোমরা দু'টিতে মিলে মাঠে ততোক্ষণ ছুটোছুটি করে' খিদেটাকে ধারালো করে' আনো। হ্যাঁ, তোকে রাঁধতে দিলেই হয়েছিলো করু, বেচারা বাবাজিকে পাঁচটি ঘণ্টা সমানে চাঁদের দিকে হাঁ করে' চেয়ে থাকতে হ'ত। বসে'-বসে' এই গোঁফ-দাড়িওলা বুনো বুড়োর সঙ্গে গল্প করতে হ'লেই হয়েছিলো আর-কি। যা, যা, পালা। দিব্যি একটু হেঁটে এস, বাবাজীবন। ওরে জহর, হ'ল? তুই যে সমস্ত রাত ধরেই' আজ মাছ কুটবি। তিন সের দুধে কী ছাই পায়েস হ'বে শুনি—হরেকিষ্টর বাড়ি থেকে আরো সের দুয়েক কিনে আন্ গিয়ে—বলিয়া উবু হইয়া বসিয়া তিনি উনুন খোঁচাইতে লাগিলেন।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে খাইবার জায়গা হইয়া গেল। এখানেও তিনি আমাদের দুইজনকে আগে খাওয়াইবেন, আমরা আগে না খাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার নাকি ক্ষুধাই পাইবে না। কিন্তু তাঁহার এই আবদার আর আমি রাখলাম না, বলিলাম,—আপনিও আমাদের সঙ্গে বসে' না খেলে আমরা রীতিমত হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক্ করবো।

করুণা ঠাঁই করিয়া দিল। পিসেমশাই বলিলেন,—ততোক্ষণ তোমরা পিঁড়ি পেতে বসে' গল্প করো, আমি পুকুরে নেমে দুটো ডুব দিয়ে আসছি। গা একেবারে তেতে গেছে—

করুণা বুঝি তাঁহাকে বাধা দিতে যাইতেছিল, তিনি হাসিয়া

কহিলেন,—ভয় নেই, রোজ রাতেই আমি নাই, আমার অসুখ করে না। এই এলাম বলে'।

খাওয়া-দাওয়ার পর উঠানে পাটি বিছাইয়া তিন জনে বসিলাম। করুণার কথায় জহর ঘর হইতে সেতারটা আনিয়া দিল। রাত অনেক হইয়াছে, চাঁদ ডুবিয়া গেলেও আকাশে আলোর কোমল একটি আভা এখনো টল্‌টল্‌ করিতেছে। সেতারটা তুলিয়া লইয়া পিসেমশাই কহিলেন,—আমার এই বাজনা না শুনে,—ভাবছিলাম আমিই তোমাদের বাজনা শুন্‌বো।

করুণা হাসিয়া কহিল,—আচ্ছা, সে হ'বে। তুমি এখন সুরু করো দিকি!

দেখিতে-দেখিতে চারিদিকের অটল স্তব্ধতা সুরের ঝঙ্কারে গলিয়া পড়িতে লাগিল। সেই সুর এমন করুণ ও উদাস যে মনে হইল দূরের নদী, পাট-ক্ষেত, মাঠ-ঘাট সব যেন কাঁদিতেছে। আস্তে-আস্তে হাত বাড়াইয়া করুণার আঁচলের তলায় উহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিলাম, মনে হইতেছিল বিচ্ছেদের এই কান্নার স্রোতে করুণাও যেন আমার কাছ হইতে দূরে, বহুদূরে সরিয়া যাইবে।

সেতারটা থামাইয়া পিসেমশাই কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন —সুরের আগুনে ছুরির ফলার মতো দুই চোখ তাঁহার তখনো চক্‌চক্‌ করিতেছিল। গলায় কথা পাইবার জন্য আরো খানিকক্ষণ তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমাদের মুখেও কথা আসিল না।

পিসেমশাই ধরা গলায় কহিলেন,—এবার তোদের গল্প বল

করু, শুন্‌তে আমার ভারি ভালো লাগবে। আত্মীয়তার মিথ্যা মর্য্যাদা দিয়ে আমাকে একেবারে পর করে' রাখিস নে।

করুণা কহিল,—আমাদের আর গল্প কী! চোখের সামনে দেখতেই তো পাচ্ছ সব।

পিসেমশাই দাড়িতে হাত বুলাইতে-বুলাইতে হাসিয়া কহিলেন,—আমি এখান থেকে উঠে গেলেই তো দুজনে তোরা কতো গল্প সুরু করবি, আমিই কেবল শুনতে পাবো না। আমার সামনেই গল্প কর্ না তার চেয়ে—ধর্ আমি এখানে নেই। আর অতোটা সরে' বসতে হ'বে না, বাবাজীবন। ধরো না কেন, আমি একটা প্রাচীন বুড়ো বটগাছ—আমার ছায়ায় বসে' দু'টিতে তোমরা বিশ্রাম করছ। বলিয়া পরম স্নেহে আমাদের মাথার উপর তাঁহার দুই হাত স্থাপন করিলেন। কতক্ষণ আর কথা বলিতে পারিলেন না।

—তোমাদের পেয়ে আমার কী যে ভালো লাগছে, বাবাজি, বলতে পারছি না। এত জায়গা থাকতে আমারই কাছে বিশ্রাম নিতে এসেছ ভাবতে চোখ ফেটে আমার জল আসছে। বলিয়া উদ্গত অশ্রুকে বাধা দিবার জন্যই তিনি গা ঝাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন,—কিন্তু সারা রাত ধরে' এখেনে বসে' গল্প করলে তো চল্‌বে না। চলো, ঘরে চলো—কাল সারা রাত ঘুমোতে পারো নি, ওঠো, শুয়ে পড়ো গিয়ে। বিছানা আমি করে' রেখেছি, এসো।

করুণা বিস্মিত হইয়া কহিল,—বিছানা করে' রেখেছ মানে?

—চৌকি-টৌকি জহরই অবিশ্যি ইট দিয়ে সমান করে' রেখেছে—আমি ঘরটা একটু গুছিয়ে দিয়েছি মাত্র।

ঘরের চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। দুইখানি সমতল তক্তপোষ জুড়িয়া প্রকাণ্ড বিছানা পাতা হইয়াছে,—শিয়রে ছোট একটি টুলের উপর পিতলের পিল্‌সুজে মাটির একটি বাতি মিটিমিটি করিতেছে, তাহার ধারে আমার খানকতক বই, আর একটি টেবিলের উপর পাশাপাশি দুই গ্লাস জল, চায়ের পিরিচে এলাচ-ডালচিনি, বেড়ার গায়ে সারি-সারি ধূপকাঠি গোঁজা!

করুণা অবাক হইয়া কহিল,—কখন এ-সব করলে, পিসেমশাই?

পিসেমশাই কহিলেন,—এ আবার একটা কী কাজ যার আবার সময় লাগবে! যখন পুকুর-পারে বসে' তোরা আঁচাচ্ছিলি না, তখনই গুছিয়ে রেখেছি কোনোরকমে। গরিবের ঘরে ঘুম কি তোমার আসবে, বাবাজীবন? বলিয়া বালিশের কাছ হইতে দুইটি রজনীগন্ধা তুলিয়া বলিলেন,—বেশি আজ আর ফুল পেলাম না করু, কিন্তু দু'টির গন্ধেই ঘর আমোদ হ'য়েছে। বলিয়া একটু ঘ্রাণ নিয়া ফুল দুইটি আমাদের হাতে তুলিয়া দিলেন।

—নাও, নাও, দরজা বন্ধ করে' শুয়ে পড়ো। শিয়রের জান্‌লা দুটো দিয়েই প্রচুর হাওয়া আসবে।

বলিলাম,—আপনি শোবেন কোথায়? আপনার বিছানা কই?

—আরে, আমার আবার বিছানা! পাটি বিছিয়ে দাওয়ার ওপর পড়ে' থাকবো।

প্রবলকণ্ঠে দুই জনে প্রতিবাদ করিয়া উঠিলাম। আমি বলিলাম,—সে কখনোই হ'তে পারে না। প্রকাণ্ড বিছানা, এখানেই একপাশে আপনিও শুয়ে পড়ুন।

পিশেমশাই আবার সেই উচ্চ কণ্ঠে অনর্গল হাসিয়া উঠিলেন: দূর পাগল। তোমাদের এমন সোনার রাতটা মাঠে মারা যাক্ আর-কি! বুড়োর মিথ্যে আয়াসের দিকে চেয়ে যৌবনকে বঞ্চিত করতে নেই, বাবাজি।

করুণা কহিল,—চলো, গরমের রাত, সবাই মিলে আমরা দাওয়ায় গিয়ে শুই।

তাহার গালে আস্তে এক চড় মাড়িয়া পিসেমশাই হাসিয়া কহিলেন—আমাকে দাওয়ার থেকেও তাড়িয়ে শেষকালে গোয়াল-ঘরে নিয়ে যেতে চাস? কিন্তু আমাকে তোদের ভয় কী?

তাঁহার বুকের কাছে আগাইয়া আসিয়া করুণা কহিল,—কিন্তু বাইরে শুলে যে তোমার অসুখ করবে।

তাহার চুলে হাত বুলাইতে-বুলাইতে পিসেমশাই কহিলেন, —করবে না লো, করবে না। আর নিতান্ত অসুখ যদি একটু করেই, তোর হাতের সেবা পেয়ে যাবো। যা, তুই না গেলে বাবাজি শুতে পাচ্ছেন না। বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি দাওয়ায় নামিয়া বাহির হইতে দরজাটা ভেজাইয়া দিলেন।

দুইজনে তক্তপোষের উপর দূরে-দূরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

বাহির হইতে পিসেমশাই বলিলেন,—বাক্স বোঝাই করে' এক রাজ্যের তো বই এনেছ দেখলাম, আজকে আর আলোয়

বসে’ পড়তে হ’বে না। শুয়ে পড়ো, ঘুমোও এবার, বাবাজি। আমি এখেনে বসে’ পাহারা দিলে হ’বে কী. গ্রামে চোরের কিছু অভাব নেই, দরজায় খিল চাপিয়ে রাখ্, করু।, ভয় নেই, আমি কথা তোদের কিছু শুনতে পাবো না।

করুণা হাতের হাওয়ায় বাতিটা নিভাইয়া দিল, কিন্তু এত শান্তি ও এত অন্ধকারের মাঝেও আমাদের চোখে ঘুম আসিল না।

*

* *

পরদিন বিকেল বেলা নৌকা করিয়া নদীতে বেড়াইবার জন্য করুণা ক্ষেপিয়া উঠিল। পিসেমশাই কহিলেন,—স্বচ্ছন্দে। নৌকো ঠিক করতে ঘাটে জহরকে পাঠিয়ে দিই তা হ’লে!

করুণার স্ফূর্তি আর ধরে না। কহিল,—তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হ’বে, পিসেমশাই।

পিসেমশাই কথাটাকে প্রথম অন্য ভাবে বুঝিলেন; বলিলেন, —খুব বিশ্বাসী নৌকো দেব, ভয় নেই কিছু। ঘণ্টাটাক ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে। আর, যার জিনিস, সেই তো সঙ্গে রইলো, আর তোর ভাবনা কিসের? নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারবে না তো দখল করে কী বলে’?

করুণা হাসিয়া বলিল,—সে-কথা নয়, পিসেমশাই, তুমি সঙ্গে

না থাকলে বেড়াতে সত্যিই ভালো লাগবে না। কে আমাদের সব জিনিস দেখিয়ে বেড়াবে বলো?

আদর করিয়া তাহার গালে এক ঠোনা মারিয়া পিসেমশাই কহিলেন,—দূর পাগলি! আমি সঙ্গে থাকলে সমস্ত বেড়ানোটাই তোদের মাটি হ'য়ে যাবে যে। সুর কেটে যাবে একেবারে। এমনি তো বুড়োর সামনে কেমন তোরা জড়োসড়ো হ'য়ে থাকিস, জোর করে' হাসিস্ না পর্য্যন্ত। আর, কীই বা দেখাবার এখানে আছে শুনি? খালি জল আর মাঠ, নিজেই তোরা ভালো করে' দেখতে পারবি।

জোর দিয়া বলিলাম,—না। আপনাকে যেতেই হ'বে সঙ্গে।

—বুড়োর ওপর মিথ্যে মায়া দেখাচ্ছ, বাবাজি। তোমাদের সামনে একগাল দাড়ি নিয়ে হাঁদার মতো বসে' থেকে আমি করবো কী! এমন সুন্দর সন্ধ্যায় নদীর জলে বসে' শেষে কি না তোমাদের এই বুড়োর সঙ্গেই খোসগল্প করতে হ'বে! কল্‌কাতায় ফিরে শেষকালে আফ্‌শোষ করবে, বাবাজীবন।

করুণা কহিল,—তা কেন? তুমি তোমার সেতার নিয়ে বস্‌বে, ঢেউয়ের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা তোমার বাজনা শুনবো!

মুহূর্ত্তে পিসেমশাইর দুই চোখ দীপ্ত হইয়া উঠিল; উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিলেন,—সেতার নয়, একেবারে বৈঠা নিয়েই বস্‌বো তবে। ওরে জহর, নৌকা আর ভাড়া করতে হ'বে না, আমার ডিঙিখানা বার করে' রাখ্ গিয়ে। এছাক্‌কে খবর দে। সেও সঙ্গে যাবে। বৈঠা দিয়ে জলের বাজনা শোনাবো তোমাদের।

কথা শুনিয়া করুণা লাফাইয়া উঠিল। সাজিয়া নিবার সময় পর্য্যন্ত তাহার হইল না। সাদাসিধে একখানি সাড়ি পরিয়া, চুলে ফাঁস খোঁপা বাঁধিয়া, লপেটা পায়ে দিয়া সে আগে-আগে বাহির হইয়া পড়িল। পিসেমশাই পাল্কির কথাটা পাড়িবার পর্য্যন্ত সময় পাইলেন না।

অবশেষে নৌকা ছাড়িয়া দিল। দুই কিনারে পিসেমশাই ও এছাক্ মিঞা বৈঠা নিয়া বসিলেন। ছইয়ের বালাই ছিল না, পাটাতনের উপর একটা চট্ বিছাইয়া জুতা খুলিয়া আমরা একটু দূরে-দূরে বসিলাম।

আনন্দে কম্পমান দীর্ঘ একটি দীপশিখার মতো করুণা জ্বলিতে লাগিল; পিসেমশাই জামার আস্তিন গুটাইয়া বৈঠা টানিতে-টানিতে গুন্‌গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিতে লাগিলেন।

পিসেমশাই হাসিয়া কহিলেন,—কই, মুখ বুজে বসে' আছ কেন এখন? একটু গল্প-সল্প করো এবার।

কহিলাম,—এ বুঝি কথা কইবার সময়? চুপ করে' বসে'-বসে' জল দেখছি।

করুণা ছেলেমানুষের মতো কহিল,—এতো কাছে এতো জল এর আগে কখনো আর দেখিনি, পিসেমশাই।

—ছাই দেখছ তবে! পিসেমশাই হাসিয়া উঠিলেন: ভালোবাসার দুয়েকটি কথা-বার্ত্তা বলো না চুপিচুপি, কবে আর শুনতে পাবো বলো? দিন তো আমার ফুরিয়ে এলো। বলিয়া জোরে তিনি বৈঠা টানিতে লাগিলেন।

তবু তাঁহাকে শুনাইয়া করুণার সঙ্গে নিভৃত অন্তরঙ্গতায় কী যে কথা কহিব ভাবিয়া পাইলাম না। পৃথিবীতে কথা কহিবার কী-ই বা আছে? বসিয়া-বসিয়া মুগ্ধ চোখে বিশাল জল ও পিসেমশাইর বলদৃপ্ত বাহু দেখিতেছি। পিসেমশাইর শরীরে নতুন করিয়া যেন যৌবন আসিয়াছে, রক্তের প্রবলতায় তাঁহার কপালের ও হাতের শিরা ফুলিয়া উঠিল। হাওয়ায় চুল ও দাড়ি উড়িতেছে, দুই হাত ব্যাপৃত থাকায় তাহা আর বিন্যস্ত হইতেছে না—তাঁহার মাঝে ঠিক প্রাচীন দিনের সমুদ্রগামী যুদ্ধ-জাহাজের বীর দুর্দ্ধর্ষ নাবিককে দেখিলাম। অত বড় জীবনের সামনে নিজেকে আমার যে কত ক্ষুদ্র, কত সঙ্কীর্ণ ও কত অপ্রচুর বলিয়া মনে হইল!

করুণা কহিল,—কী অমন খালি ধার দিয়ে যাচ্ছ, পিসেমশাই। মাঝনদীতে চলো, পাড়ি দাও। যেখানটায় জল খুব গভীর, সেই জল ছুঁতে ভারি ইচ্ছে করছে।

—বহুৎ আচ্ছা। জোরসে টান্, এছাক্। বলিয়া নৌকার পাটাতনে পা ঠেকাইয়া পিসেমশাই প্রায় আধ-শোয়ার ভঙ্গিতে বৈঠা টানিতে সুরু করিলেন।

এছাক্ মিঞা আপত্তি করিতে লাগিল: পাড়ি দিয়ে ফের ফিরতে অনেক রাত হ'য়ে যাবে।

ভঙ্গিটাকে শিথিল করিয়া পিসেমশাই কহিলেন,—কথা মন্দ বলে নি। ফিরে আবার তো সেই রান্না-বান্না করতে হ'বে! জহর সব ঠিক জোগাড়-যন্ত্র করলো কি না কে জানে। যেমন গেঁতো—

করুণা অস্থির হইয়া কহিল,—হোক্ একটু দেরি। চলো ওপারে। আমরা তো তোমার কাছে এখেনে রুটিন-মাফিক্ জীবন-যাপন করতে আসিনি।

ওপারে যাইবার ইচ্ছা আমারো বিশেষ ছিল না, তবু করুণাকে বঞ্চিত করিতে কেমন-যেন কষ্ট হইল। হাসিয়া কহিলাম,—ওপারে গিয়ে আর দরকার নেই। মাঝ-নদীতে করুণাকে একবার জল ছুঁইয়ে ফিরে এলেই চল্‌বে।

পিসেমশাই খুসি হইয়া বৈঠা চালাইতে সুরু করিলেন। কহিলেন,—সত্যি কথা বলেছিস করু, যারা ভালোবাসে, জীবনে যাদের এখনো অনেক আয়ু, অনেক আশা, তারা রুটিন মেনে চলবে কেন? রুটিন্ মানবো আমরা, যারা পারের কাছে আছি—কী বলো, বাবাজি?

বলিলাম,—আমাদের পাল্লায় পড়ে' আপনিও যে আজ রুটিনের বাইরে চলে' এলেন।

—না এসে করি কী বলো! তোমরা কি আমাকে আর বুড়ো হ'য়ে থাকতে দিলে নাকি?

যাহা ভয় করিয়া গোপনে মন আমার দুর্বোধ ভাষায় নিষেধ করিয়াছিল, দেখিতে-দেখিতে তাহাই উচ্চারিত হইয়া উঠিল। বলা কহা নাই, মুহূর্ত্তমাত্র সঙ্কেত না করিয়া আকাশ একেবারে কালি করিয়া আসিয়াছে ও সুস্থ হইয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ না দিয়াই প্রবল ঝড়ের সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টি নামিয়া আসিল। পূর্ব্ববঙ্গের নদীর উপর এমনি অতর্কিতে যে

ঝড় আসে তাহা কাগজেই খালি পড়িয়াছিলাম, কিন্তু চোখের সামনে তাহার সেই রুদ্র বিভীষিকা দেখিয়া মুখ শুকাইয়া গেল। তখন আমরা মাঝ-নদীতে আসিয়া পড়িয়াছি, উপরে আকাশের সঙ্গে মিল রাখিয়া নদীও উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া একেবারে কাদা হইয়া গেলাম। ইহারই মধ্যে করুণা যে কী করিয়া প্রথমে নবধারাজলে স্নান করিবার বায়না ধরিয়া গান জুড়িয়াছিল, ভাবিয়া পাইলাম না। এখন তাহার মুখের দিকে তাকাইতেও ভয় করিতে লাগিল।

নৌকা পারের দিকে ফিরিয়া চলিল,—এছাক্‌ ও পিসেমশাই প্রাণপণ জোরে বৈঠা টানিতে লাগিলেন। আরো জোরে ঝড় ছুটিল, ও আরো মুষলধারে বৃষ্টি—চারিদিক ঘিরিয়া পাহাড়ের মতো দৃঢ়, অনড় অন্ধকার। ইহার মধ্যে দিয়া নৌকা আর পথ খুঁজিয়া পাইল না—ঝড়ের মুখে কুটার মত উড়িয়া চলিল, বৈঠার সমস্ত কায়দা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ধারে-কাছে কোথাও এতটুকু আশ্রয় নাই—আগাগোড়া জল আর অন্ধকার! করুণা আর্তনাদ করিয়া উঠিল : কী হবে, পিসেমশাই?

পিসেমশাইও চীৎকার করিয়া উঠিলেন: কিছু ভয় নেই তোর, মা। ঠিক তোদের পারে পৌঁছে দেব।

বুঝিলাম তাঁহার সেই আশ্বাসের মাঝে কিছুই সত্য নাই—ঢেউয়ের চূড়ায়-চূড়ায় আছাড় খাইয়া নৌকাটা প্রায় কাৎ হইয়া পড়িল। পিসেমশাই ছাড়া আমরা বাকি তিনজন সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিলাম—আর রক্ষা নাই।

সহসা অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল। সেই নীল, তীব্র আলোতে পিসেমশাইকে দেখিলাম,—কিন্তু কী যে দেখিলাম স্পষ্ট বিশ্বাস হইল না। নিদারুণ্ শারীরিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের স্নায়ু কোথায় ছিঁড়িয়া গেছে, তাজা রক্তে ও ঘোলাটে ফেনায় দাড়ি ও জামা ভিজিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে, গলাটা স্ফীত, চক্ষু দুইটা রক্তবর্ণ, মুখ নীল, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত—হাত-পায়ের ভঙ্গি শিথিল, এই যেন এখুনি ভাঙিয়া পড়িবেন। বৈঠা আর টানিতে পারিতেছেন না, মাথাটা ঘাড়ের এক দিকে এলাইয়া পড়িয়াছে।

এদিকে অনর্গল জল, রাশি-রাশি গর্জ্জমান ফেনিল ঢেউ, ঝড়ের ঝাপ্‌টায় অন্ধকার অট্টহাস্য করিতেছে। অত্যাসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া নিজেকে কী যে অসহায় লাগিল বলিতে পারি না।

করুণাকে দুই বাহুর মধ্যে প্রাণপণ আগ্রহে জড়াইয়া ধরিলাম। করুণা ভয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল: পিসেমশাই!

ডাক শুনিয়া পিসেমশাই যেন নড়িয়া উঠিলেন। ক্লান্ত অবশ স্বরে কহিলেন,—ভয় নেই মা, এই তো আমি আছি। তোদের ঠিক আমি পারে নিয়ে যাব দেখিস। মৃত্যুর কাছে যৌবনকে আমি কক্‌খনো হারতে দেব না, করু।

কিন্তু সময় ঘনাইয়া আসিল। কাছেই পার দেখা যাইতেছে বটে, করুণাকে লইয়া এটুকু জল কোনোরকমে সাঁতরাইয়া পার হইব বলিয়া খানিকটা হয় তো ভরসা হইল—কিন্তু নিতান্তই

আমাদের বাঁচিবার স্পৃহাকে ব্যঙ্গ করিবে বলিয়া ঢেউ আর ঝড় মিলিয়া নৌকাটাকে সেইখানে উপুড় করিয়া ফেলিল। তবু তখনো মনে হইল সেই অমিতবিক্রম বৃদ্ধ পিসেমশাই ছাড়া আমাদের বাঁচাইবার আর কেহ নাই। জলে পড়িয়া দুইজনে চীৎকার করিয়া উঠিলাম : পিসেমশাই !

জলের তল হইতে নদীই যেন কহিল : ঠিক পারে এনে পৌঁছে দিয়েছি, বাবাজি। বাকি পথটুকু করুকে নিয়ে কোনো-রকমে সাঁৎরে যাও শিগগির—ঢেউটা এবার একটু দমেছে। তক্তাটা ছেড়ো না—এছাকৃকে বলো, করুকে ধরুক্।

চাহিয়া দেখি এছাক্ নিজের প্রাণ লইয়া অন্য দিকে সাঁতার কাটিতেছে।

করুণা নিস্পন্দ হইয়া আমার বাহুর মধ্যে যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা টের পাইলাম। কিছুদূর আসিতেই পায়ে মাটি ঠেকিল। কিন্তু বিপুল অন্ধকারে চারিদিকে চাহিয়াও পিসেমশাইকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধের মতো দৃষ্টিহীন চক্ষু মেলিয়া ডাকিলাম : পিসেমশাই !

যেন নদী কথা কহিয়া উঠিল : পারে গিয়ে উঠেছ তো, বাবাজি ? আমার জন্যে কিছু ভেবো না তোমরা—ঠিক আছি আমি। প্রেমের কাছে মৃত্যু হেরে গেছে—আমার জীবনেও তা বহুবার দেখেছি। মরতে আর আমার ভয় নেই !

কথাটা কোথা হইতে আসিল, না, নিজের মনেই শুনিলাম, ঠিক বুঝিলাম না। বহু কষ্টে করুণাকে পারে তুলিয়া এতক্ষণে

যেন নিশ্বাস ফেলিলাম। চেঁচামেচি করাতে লোকও কয়েকটা জোগাড় হইল—ধরাধরি করিয়া করুণাকে সামনে এক চাষার বাড়িতে লইয়া আসিলাম। বাড়ির মেয়েরা উহার কাপড়চোপড় ছাড়াইয়া আগুন করিয়া উহাকে সেক দিতে লাগিল। উহার সুস্থ হইবার সম্ভাবনায় কিছুটা নিশ্চিন্ত হইয়া দল পাকাইয়া পিসেমশাইকে খুঁজিতে বৃষ্টির মধ্যেই আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। চকিত বিদ্যুতের আলোয় তাঁহার যে-মূর্ত্তি তখন দেখিয়াছিলাম তাহাতে তিনি যে ইতিমধ্যে পারে কোথাও উঠিয়া পড়িয়াছেন তাহা বিশ্বাস হইল না।

পরদিন কোন্ একটা চরে তাঁহার মৃতদেহ আটকাইয়া আছে খবর পাইয়া করুণাকে লইয়া সদলবলে সেখানে উপস্থিত হইলাম। আশে-পাশের সমস্ত গ্রাম ভাঙিয়া পড়িল—তিনি সবাইর এত আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহ কঠিন ও শাদা হইয়া গিয়াছে, মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া সহসা ধারণা হয় না। তাঁহাকে দেখিয়া করুণা শোকে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু আমি ভাবগম্ভীর প্রস্তরমূর্ত্তির মতো সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যৌবন ও যৌবনের প্রেমকে তিনি কতো বড়ো অর্ঘ্য যে দিয়া গেলেন সমাহিত হইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। করুণা তাঁহার বুকের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া আকুলি-বিকুলি করিতেছে; কিন্তু অশ্রু-আচ্ছন্ন চোখে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি তিনি আমার দিকে চাহিয়া তেমনি হাসিয়া বলিতেছেন: সাবাস বাবাজি, জীতা রহো!

নীরব কবি

বসন্তের বাড়ি ফিরতে-ফিরতে প্রায় এগারোটা। রান্নাঘর ও খাওয়ার জায়গা ধুয়ে-পুঁছে ঝি কখন বিদায় হয়েছে। বসন্তর খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। কোলের ছেলেটা কাঁদছে বলে' জ্যোতির্ম্ময়ী ঘুমুতে যেতে পারছে না। মশারির ভেতরে নল নিয়ে মন্মথ পায়ের ওপর পা তুলে আলগোছে ফুড়ুক-ফুড়ুক করছে।

কড়া-নাড়ার শব্দে জ্যোতির্ম্ময়ী বলে' উঠলো: ধুরন্ধর এতোক্ষণে এলেন। থাকুক বাইরে দাঁড়িয়ে। বলে' সে ছেলেকে দুধ দিতে বসলো।

মন্মথ বললে,—সে কী? যাও, খুলে দিয়ে এসো। কতোক্ষণ দাঁড়াবে?

জ্যোতির্ম্ময়ী ঝামটা দিয়ে উঠলো: এতো যখন মায়া, তখন নিজে গিয়ে খুলে দিতে পারো না? আদর দিয়ে-দিয়ে তো একেবারে মাথায় তুলেছ। যা খুসি তাই করবে, পরের সুবিধে-অসুবিধের দিকে চেয়ে দেখবে না। দরজায় শত কপাল কুটলেও আমি খুলে দিচ্ছি না। ভাঙুক দরজা।

অগত্যা মশারি তুলে মন্মথকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হ'লো। দু' পা নামিয়ে খাটের নিচে জুতো খুঁজতে-খুঁজতে বললে,—তবে আমিই যাই। হিমের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে শেষকালে তো ওর অসুখ হ'তে দিতে পারি না?

ছেলেটাকে কাঁদিয়ে নিচের ঢালা বিছানার ওপর প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী উঠে দাঁড়ালো। মুখ বেঁকিয়ে বললে,—

সোনাদিদির আদরে, সর্ব্ব শরীর বিদরে। কী একখানা ভাই-ই তোমার হয়েছিলো! দুপুর রাত করে' দিগ্বিজয় করে' বাড়ি ফিরলেন, আর এখন দু'মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতেই নিমোনিয়া!

শেষকালে জ্যোতির্ম্ময়ী গেলো দরজা খুলতে।

—কী, এতো রাত করে' যে বাড়ি ফের, তোমার ভাত নিয়ে কে বসে' থাকবে?

ঘাড় চুলকে, মুখ ঈষৎ কাঁচুমাচু করে' বসন্ত বললে,—আমি আর এখন খাবো না, বৌদি, এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিলো।

কথা শুনে জ্যোতির্ম্ময়ী তেলে-বেগুনে জ্বলে' উঠলো: নেমন্তন্ন ছিলো, সে কথা আগে বলে' যেতে পারো নি? এখন এতো রাজ্যের ভাত-ডাল সব নর্দ্দমায় ফেলে দিতে হ'বে তো?

ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসি এনে বসন্ত বললে,— নেমন্তন্ন আগে ছিলো না। গেলাম পর খাইয়ে দিলে। না কী করে' বলি বলো?

—তা বলবে কেন? এ যে নিতান্ত ডাল-ভাত। তবু যদি বুঝতাম নিজে খেটে দু' মুঠো জোগাড় করতে পারো। পরের ঘাড়ে চড়ে' খাচ্ছ কি না, তাই গায়ে আর কিছু লাগে না, না?

ঘরের ভেতর থেকে মন্মথ স্ত্রীকে ধম্‌কে উঠলো: কি বলছ যা-তা?

জ্যোতির্ম্ময়ী ততোধিক গোলমাল সুরু করলে : না, বলবে না ? এতোখানি বয়েস হ'লো, কৈ দাদাকে এখন দু'পয়সা সাহায্য করবে, তা না, তার জিনিস-পত্রের খালি লোকসান করা। এতো লেখাপড়া শিখে একটু তো জ্ঞান হ'লো না দেখি ? এখন এই ভাত-তরকারি নিয়ে আমি কী করি ? একমুঠো কম হ'লো বলে' ঝি-মাগী তো গজ-গজ করতে চলে' গেল।

কাঁধের চাদরটা কোমরে জড়িয়ে নিতে-নিতে বসন্ত হাসিমুখে বললে,—দাও, তোলো ঢাক্‌নাটা, যা হোক্ করে' সাবাড় করে' ফেলি। নর্দ্দমায় না গিয়ে আমার উদরে গেলেই তো হ'লো ? বলে' সত্যি-সত্যি সে পিঁড়ে পাতলে।

মন্মথ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে,—ভরা পেটে ওগুলো এখন খেয়ে তোর অসুখ করতে হ'বে না। যা, ঘুমোগে যা।

পিঁড়ের ওপর উবু হ'য়ে বসে' বসন্ত বললে,—কিছু হ'বে না। দেখি না চেষ্টা করে'।

তার হাত ধরে' টেনে তুল্‌তে-তুল্‌তে মন্মথ বললে,—তোরও যেমন ! কার না কার কথায় তুই এই ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাতগুলো এখন গিল্‌তে বসেছিস্ ! যায় যাবে নষ্ট হ'য়ে, তাই বলে' শরীর খারাপ করবি নাকি ?

বসন্ত উঠে পড়লো।

জ্যোতির্ম্ময়ী বললে,—বেশ তো, ঠিক সময়ে বাড়ি এসে গরম ভাত খেলেই হয়। কেন রোজ-রোজ দুপুর-রাতে এসে তুমি এমনি জ্বালাবে ? মাগ্‌গি-গণ্ডার দিনে এতগুলো জিনিস কোত্থেকে

আসে তার হিসেব রাখো? নিজে যখন রোজগার করবে, তখন ঠাণ্ডা-গরম নিয়ে আবদার করো, তার আগে নয়। ও-মুখে অমন কথা সাজে না।

মন্মথ বললে,—তোমার কাছে তো আবদার করতে আসছে না।

—ঐ নাই দিয়ে-দিয়েই তো মাথাটি খেয়েছ। এত বড়ো সোমত্থ ব্যাটাছেলে, এক পয়সা কোনোদিন ঘরে আনতে দেখলাম না, বসে'-বসে' খালি কেতাব লিখে চলেছেন, আর তাইতেই দাদাটির ল্যাজ তুলে নৃত্য আর থামছে না! এতোটুকু কোনোদিন শাসন করবার নাম নেই। আর আমি দাসী-বাঁদি সমস্ত দিন-রাত এদের জন্যে খালি খেটে মরবো!

মন্মথ কোমল করে' বললে,—সামান্য একথালা ভাতের জন্যে তোমার এমনি শোক উঠলো কেন? কাল সকালে ধাঙড়কে দিয়ে দিলেই চলবে।

—আহা, কথা শুনে সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেলো। একটুকরো মাছ ছিলো; ছেলেপিলেদের কাউকে না দিয়ে ওর জন্যে রাখলাম, আর তা আমি এখন ধাঙড়ের মুখের সামনে তুলে ধরি! এমন করে'ই সংসারের তুমি আয় দেখবে? এতোগুলি ভাত—একগাদা তরকারি—

মন্মথ বললে,—ভাত জলে দিয়ে রেখে দাও না, কাল ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করলেই তো বেঁচে গেলো!

জ্যোতির্ম্ময়ী বললে,—কী সব ব্যবস্থা করছেন! পেট-রোগা ছেলেপিলের ঘরে আমি পান্তা মিশিয়ে ভাত রাখি আর কি!

তার চেয়ে তোমার গুণধর ভাইকে সোজাসুজি বলে' দাও—এতো রাত করে' বাড়ি ফিরলে এমন তৈরি ভাত আরো কোনোদিন পাচ্ছেন না। বলে' রাগে সে ফুল্‌তে লাগলো।

মন্মথ বসন্তর গায়ে ছোট একটি ঠেলা দিয়ে বললে,—তুই কি শুনছিস দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে? এই সব ছোট কথায় তোর কী কান পাততে আছে? যা, তোর ঘরে যা।

বসন্তর ঘর দোতলায়। ওপরে সেই একখানি মাত্র ঘর। সামনে খোলা ছাত—চারিদিক একেবারে ফাঁকা। বসন্ত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগলো।

তার ঘরে চলে' গিয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী আপন মনে গজ-গজ কর্‌তে লাগ্‌লো: ওপরে একখানি মাত্র ঘর, তাই সখ করে' ভাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে এই ঘিঞ্জি চাপা ঘরে একগুষ্টি লোক হাঁপিয়ে মর্‌ছি আর উনি একা ঘরে চিৎপাত হ'য়ে হাওয়া খাচ্ছেন। বাড়ির যে রোজগেরে কর্ত্তা সেই জানি ভালো ঘরখানা নিজের জন্যে নেয়, পরকে আরাম করবার জন্যে তা ছেড়ে দিয়ে নিজে এঁদো ঘরে থাকে—বাপের জন্মে এমন কথা কখনো শুনিনি। আমার যেমন কপাল! তা, ভাইকেও বলিহারি! ভালো ঘরে শোবে, ভালো জামা-কাপড় পরে' বাবুগিরি করবে, অথচ দাদার হাতে একটা কাণাকড়ি দেবারো নাম নেই। আল্‌নায় নিজের সাত-জোড়া জুতো, এদিকে দাদার পায়ে তালতলার চটি। তবু যদি বুঝতাম, নিজের পয়সায় বাছাধন উড়ছেন! একজনের রক্ত শুষে-শুষে তার এখন তেজ কী!

এখন শুতে গেলে স্ত্রীর বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হ'তে হ'বে। সেই ভয়ে মন্মথ ঘরে গেলো না। সোজা ওপরে উঠে এলো।

তক্তপোষের ওপর থেকে এক রাজ্যের বই নামিয়ে বসন্ত তখন বিছানাটা নতুন করে' পাতবার চেষ্টা করছে, মন্মথ ঘরে ঢুকেই নাক সিঁট্‌কে বলে' উঠলো,—ইঃ, ঘর-দোর এ কী নোংরা হ'য়ে আছে! বই-খাতা সব ওলোট-পালোট, লেখা-পত্তর সব ছত্রখান, এখানে-ওখানে ময়লা—এ-ঘরে কেউ একদণ্ড থাকতে পারে নাকি? রাখ্, রাখ্, বিছানা পাতছিস কী—মন্মথ অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো: দাঁড়া, ঘর আগে ঝাঁট দিয়ে নে। এ-ঘরে ঝাঁট পড়ে না বুঝি কোনো দিন? দাঁড়া, নিচে থেকে ঝাঁটা একটা এনে দিচ্চি—

বসন্ত লজ্জিত, কুণ্ঠিত হ'যে বল্‌লে,—তুমি পাগল হ'লে না কি, দাদা? এটুকু নোংরাতে কী এসে যায়!

—আল্‌নার নিচে একরাজ্যের ময়লা কাপড়—লণ্ড্রিতে আমিই তো দিয়ে আস্‌তে পারি। তোর না-হয় সময় হয় না, আমাকে বল্‌তে তো পারিস! আর এতো সব দামী-দামী বই, যাকে-তাকে এসে ঘাঁটতে দিস্ কেন? সবাই কি আর তার মর্ম্ম বোঝে? বলে' মন্মথ অতি সুকোমল স্নেহে বইগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে' সাজাতে লাগলো। বললে,—ঠিক মতো রাখছি কি না ছাখ, কোন্ লেখকের গা ঘেঁসে কোন্ লেখককে এনে বসাচ্চি—কার কী দাম, আমরা কী বুঝি বল্?

ততক্ষণে বসন্ত বিছানাটা কোনোরকমে পেতে ফেলেছে। বল্‌লে,—এক রকম করে’ রাখ্‌লেই হ’লো।

—আর, এইটেই বুঝি তোর সেদিন বেরুলো? মন্মথ সেল্‌ফ-এর থেকে বসন্তর সদ্যপ্রকাশিত নতুন উপন্যাসখানি টেনে আন্‌লে: তিন-তিনবার পড়লাম। সব তেমন বুঝি না, কিন্তু বুঝি না বলে’ই বারে-বারে পড়তে ইচ্ছে হয়। যারা বোঝে বলে’ বড়াই করে’ তোর নিন্দা করে, আমি যদি লিখতে পারতাম বসন্ত, তো কলমের খোঁচায় ওদের গুঁড়ো-গুড়ো করে’ দিতাম। আমি যে কিছু বুঝি না আমিও ওদের চেয়ে ভালো বুঝি। তা, তুই কেন ওদের সমালোচনার কিছু প্রতিবাদ করিস্ না?

সামান্য একটু হেসে বসন্ত বল্‌লে,—ও কি আমার কাজ?

মন্মথ জোর গলায় বল্‌লে,—নিশ্চয় নয়, ততোক্ষণ একটা কবিতা বা গল্প লিখলে পৃথিবীর ঢের বেশি উপকার হ’বে। যারা সৃষ্টি করতে পারে না, তারাই করে সমালোচনা—ওদের কথায় কান দিতে গেলে চলে না, কী বলিস্? কিন্তু আমাকে যদি কী করে’ লিখতে হয় শিখিয়ে দিতে পারতিস—আমি ওদের একবার দেখতাম! জীবনে কোনোদিন পড়াশুনোই করলাম না। বিদ্যে না থাকলে কি ও সব কিছু বেরোয়? হ্যাঁ,—মন্মথ হঠাৎ চঞ্চল হ’য়ে উঠ্‌লো: সেদিন কোন্ কাগজে না তোর এক লম্বা সুখ্যাত্ বেরিয়েছে দেখলাম,—দিস্ তো একবার কাগজখানা, আমাদের যোগেন ঘোষালকে একবার

দেখিয়ে আস্‌বো। বিদ্যে তো ঐ বোধোদয়—ব্যাটা আবার কথা কইতে আসে!

বসন্ত সলজ্জ একটু হেসে চেয়ারটা সাম্‌নে টেনে দিয়ে বল্‌লে,—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস। কে যোগেন ঘোষাল?

—হ্যাঁ, যা বলেছিস্‌,এই বিরাট পৃথিবীতে কে যোগেন ঘোষাল? তার মতের আবার একটা দাম! না, না, তার জন্যে তোর ব্যস্ত হ'তে হ'বে না—তোর মন যা চায় তাই তুই লিখে যাবি, কারু দিকে ফিরে চাইবি না—একলা নিজে খুসি হ'লেই ভাববি যথেষ্ট হ'লো। বুঝলি? মন্মথ চেয়ারে বস্‌লো। তার পর অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে জিগ্‌গেস করলে: নতুন কিছু লিখলি?

বসন্ত বল্‌লে,—ক'দিন থেকে কিছু লিখ্‌তে পারছি না।

—বলিস্‌ কী! নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনে মন্মথ নিমেষে পাংশু হ'য়ে গেলো: সে কী কথা!

—ক'দিন থেকে লেখবার কেমন মুড্‌ নেই।

—কেন, হ'লো কী? মন্মথ চঞ্চল হ'য়ে ঘরের চারদিকে চোখ ফেরাতে লাগলো; বল্‌লে,—হ'বে না? ঘর-দোর অমন নোংরা একহাঁটু হ'য়ে থাকলে কেউ লিখতে পারে? কাপড়-চোপড় পর্য্যন্ত ময়লা হ'য়ে আছে। কোনোদিকে তো নজর দিবি না, মুখ ফুটে কাউকে বলতে যাবি না কোনোদিন—একেবারে কবি তো কবি! কী হয়েছে তোর—আমাকে বল্‌; টাকা-পয়সার দরকার পড়েছে কিছু?

বসন্ত হেসে উঠলো; বল্‌লে,—তুমি একেবারে পাগল। কী আবার হ'বে—এমনি ক'দিন লিখতে পারছি না।

—এমনি লিখতে পারছিস না, কেন, তার মানে কী? শরীর ভালো আছে তো? হজম-টজম বেশ হচ্ছে? ফাউন্টেন-পেন্‌এর নিবটা সেই সারিয়ে এনেছিলি? কেন লিখতে পার্‌ছিস্‌ না? ছাতে ছেলে-পিলেরা বুঝি আবার বল পিটছে? এতো করে' বারণ করে' দিলাম, দাঁড়া—আমি দেখাচ্ছি।

বসন্ত বল্‌লে,—না-লেখবার বিশেষ কোনো কারণ নেই, মাঝে-মাঝে এমনি ডাল্‌নেস্‌ আসে—শত জোর করে'ও তা দূর করা যায় না। আবার হঠাৎ একদিন আপনি থেকেই কেটে যায়।

—আপনি থেকেই যায় তো কেটে? মন্মথ উৎফুল্ল হ'য়ে জিগগেস্‌ করলে।

—হ্যাঁ, আবার কখন আচম্‌কা সমস্ত মন বলি-বলি করে' ওঠে। এই ক'দিন বিশ্রী বৃষ্টি যাচ্ছিলো না, মাথায় কবিতার কতো টুকরো লাইন ঘুরে বেড়াচ্ছে, গল্পের কতো ভাসা-ভাসা আইডিয়া—অথচ বসে' যে জোড়া-তোড়া দেবো তার এতোটুকু উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। অথচ সমস্ত দিনরাত বাড়িতেই একরকম বন্দী হ'য়ে ছিলাম।

মন্মথ বল্‌লে,—কিন্তু কাল থেকেই তো বৃষ্টিটা ধরে' গিয়েছে। আজ তো দিব্যি খটখটে রোদ ছিলো।

—হ্যাঁ, আজ সারা সন্ধ্যাটা রাস্তায়-রাস্তায় একলা টহল

দিয়ে গল্পটাকে জমাট করে' এনেছি। তারপর বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সেই সম্পর্কে একটু আলোচনা করে' এসে এখন তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছে। আজ, এখন ঠিক লিখে ফেলবো দেখো। প্রথম দু' তিন পৃষ্ঠাই যা কষ্ট, তারপর বাকিটা একেবারে জলের মতো সোজা। কোথাও আর ঠেক্‌তে হয় না।

—তাই বল্। প্রবল উৎসাহে মন্মথ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌লো: লিখতে পারবি না কী! জান্‌লাগুলো ভালো করে' খুলে দে, দুয়েকটা তারাও নিশ্চয় চোখে পড়বে। আমি এখানে বসে' আছি কী করতে! মিছিমিছি বকাচ্ছি খালি। এতোক্ষণে তোর প্রথম পৃষ্ঠাটা প্রায় শেষ হ'য়ে আসতো। মন্মথ হাতের বইটা সেল্‌ফে গুঁজে রেখে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে পা বাড়ালো।

বসন্ত দু' পা তার দিকে এগিয়ে এসে বল্‌লে,—না, না, বোস না আরেকটু!

—পাগল! আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে-বল্‌তে গল্প তোর হারিয়ে যাবে।

—আর ভয় নেই। তুমি বোস। আজ অনেকটা রাত জাগতে পারবো বলে' মনে হচ্ছে।

মন্মথ বল্‌লে,—বেশি রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে যে। কাল দেখবি ভালো হজম হয় নি।

—কিন্তু এক সিটিংএ লেখা শেষ না করলে আমার ভালো লাগে না, দাদা। কেমন সুর কেটে যায়। আবহাওয়া বদলে

গেলে লেখার স্বাস্থ্যহানি হয়। ঘণ্টা চারেক খাটলেই শেষ হ'য়ে যাবে। ছোট্ট গল্প।

কাতর স্বরে মন্মথ বল্‌লে,—রাতেই বুঝি তোর লেখার আইডিয়া আসে? দিনের বেলায় বদ্‌লে নিতে পারিস্ না?

বসন্ত বল্‌লে,—কোনো-কোনো ভাব রাতেই বেশি আত্ম-প্রকাশ করে।

—তবে সুরু করে' দে—শেষ হ'তে-হ'তে সেই প্রায় চারটে? তারপর ঘণ্টা দু' তিন ঘুমিয়ে নিস্ যেন। চা-টা কাল সকালে ওপরে পাঠিয়ে দিতে বলবো। চা খেয়ে আবার আরেক ঘুম। আমি এবার চলি। কাল সকালে এসেই দেখবো তোর গল্প তৈরি। আমাকে কিন্তু আগে পড়িয়ে নিস্। ছাপার অক্ষরের চাইতে তোর হাতের লেখাটাই আমার বেশি ভালো লাগে। কোন্ কাগজে দিবি? কতো তোকে দেবে? যা, মিছিমিছি তোর সময় নষ্ট করছি—সে সব পরের কথা, আগে গল্পটা তো লেখা হোক। কুঁজোয় জল আছে? লিখতে বস্‌বার আগে জল গড়িয়ে নিস্, পরে লিখতে-লিখতে উঠতে হ'লে ভারি মুস্কিল হ'বে। আর কিছু তোর লাগবে? এ কি, দেশলাইর বাক্সে যে একটাও কাঠি নেই!

লজ্জিত হ'য়ে বসন্ত বল্‌লে,—না, না, কিছু লাগবে না।

—আচ্ছা, আমি যাই। আমরা সবাই ঘুমুবো, আর তুই জেগে-জেগে লিখবি। মন্মথ দরজার কাছে চলে' এসে হঠাৎ খুসি হ'য়ে বলে' উঠলো: আকাশে দিব্যি এক টুক্‌রো চাঁদ উঠেছে, বসন্ত।

রাতের আকাশ এমনি নীল হয় নাকি? খুব ভালো করে' লিখিস যেন—তা, আমি গল্পের কী বুঝি বল্!

মন্মথ নিচে নামবার জন্য সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখেছে, পেছন থেকে বসন্ত ডাকলে: দাদা, শোনো।

মন্মথ ফিরলো, উদ্বিগ্ন হ'য়ে বল্লে,—কী?

—আরেকটু বোস, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—কী কথা? কিছু লাগবে তোর? এখন এক পেয়ালা চা পেলে ভালো হয় বল্ছিস? তোর বৌদিকে বল্বো? না, দাঁড়া, আমিই নিচে থেকে বরং ষ্টোভ-প্যান্ সব নিয়ে আসছি।

বসন্ত বল্লে,—না, তুমি বোসো। জরুরি কথা।

মন্মথ নিরুপায় হ'য়ে বস্লো। বল্লো,—কী তোর এমন জরুরি কথা পড়লো যে এখুনি বল্তে হ'বে? কাল সকালে বল্লে চলে না? এদিকে সময় যে যাচ্ছে—

—তা যাক্। বসন্তও বস্লো।

—হ্যাঁ, শেষকালে গল্পের লগ্ন পেরিয়ে যাক্ আর-কি। নে, চট্পট্, কী তোর কথা?

আম্তা-আম্তা করে' বসন্ত বল্লে,—আমি বল্ছিলাম কি, গল্প-উপন্যাস লিখে মাসে-মাসে কিছু-কিছু তো আমি পাই—গড়ে এই পঞ্চাশ-ষাট টাকা হয়। তার থেকে কিছু আমি তোমাকে দেবো—তোমার—

হঠাৎ সবলে তার দুই হাত চেপে ধরে' মন্মথ বল্লে,—খবরদার, বসন্ত। তোর বৌদির কথায় তোর অপমান হয়েছে বুঝি?

—অপমান নয়। কিন্তু কিছু-কিছু তোমাকে দিলে তোমার সত্যিই খানিক উপকার হয়। কেন তুমি নেবে না?

—আমি নিতেই বা যাবো কেন? তোর কতো খরচ—চোখ মেলে আমি তা দেখতে পাই না?

বসন্ত অল্প একটু হেসে বল্‌লে,—সবই তো প্রায় বাজে খরচ। বেশির ভাগ বাবুগিরি করে'ই তো উড়োই।

মন্মথ বল্‌লে.—সে-কথা তোর বৌদির মতো মেয়েছেলেরা বল্‌বে বটে। কিন্তু একটু বাবুগিরি না করলে আর সাহিত্যিক কী! তুই তো আমাদের মতো সাধারণ নস্‌—তুই যে আলাদা! পোষাকে-পরিচ্ছদে আচারে-ব্যবহারে তোর মর্য্যাদা চাই—ভিড়ের মাঝখান থেকে তোকে এক পলকে সবাইর চিন্‌তে হ'বে। আমাদের সঙ্গে ভিড়ে' গেলে তোর চল্‌বে কেন?

—তবুও,—বসন্ত আপত্তি কর্‌তে লাগলো: কিছু উদ্বৃত্ত আমার হাতে থাকে—

—তা দিয়ে বই কেন্‌। জাঁকিয়ে একটা লাইব্রেরি কর্‌। পেটে বিদ্যে না থাক্‌লে কিছুতেই কিছু হয় না, শেষকালে ঘুরে-ফিরে খালি নিজেকেই নকল করতে হয়—নতুন কোনো আর পথ পাওয়া যায় না। তা যেন তোর হয় না কোনকালে, সব সময়ে তোর আধুনিক থাকতে হ'বে। পরে তার দুই হাত হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে মন্মথ বল্‌লে,—সংসারের জন্যে তুই ভাববি কেন? তার জন্যে তো আমি আছি। তুচ্ছ সংসারের জন্যেই যদি তোকে ভাবতে হ'বে তবে ঈশ্বর তোকে এই প্রতিভা দিয়েছেন কী

করতে? তোর দায়িত্ব আমাদের দায়িত্বের চেয়ে কতো বেশি। তুই ভাববি সমস্ত পৃথিবীর জন্য। যা, লিখতে সুরু কর্—মেয়েছেলের কথায় কখনো কান দিতে আছে?

বসন্তর কণ্ঠস্বর প্রায় সজল হ'য়ে উঠেছে: তুমি জানো না দাদা, ইচ্ছে করলে সত্যিই আমি তোমাকে কিছু দিতে পারি।

—তোকে দিতে হ'বে না। তুই তো আর টাকা রোজগারের জন্যে লিখছিস্ না, তুই লিখছিস্ না-লিখে তুই বাঁচতে পারবি না বলে'। এই কাজের ভার তোকে সংসার দেয় নি, দিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর। সংসারের কথা ভাবতে গেলেই তোর লেখা দিন-কে-দিন বাজারে হ'তে থাকবে—জনপ্রিয়তাই জানবি প্রতিভার শত্রু, আমি থাকতে তোর প্রতিভার এই অপমৃত্যু কখ্খনো ঘটতে দেবো না, বসন্ত। আমি তবে আছি কী করতে? সেই ছেলেবেলা থেকে তোকে মানুষ করিনি? শেষকালে আমিই তোর সর্ব্বনাশ করবো?

বসন্ত বল্লে,—বৌদি সত্যই বলছিলো, আমি এতো বাবুগিরি না করলেই তো পারি।

মন্মথ বসন্তর দুই হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লে,—রেখে দে তার কথা। একের যা বাবুগিরি, অন্যের কাছে তা মাত্র বাঁচবার জল-বাতাস। তোর বৌদির পক্ষে বছরে একবার সিনেমা দেখাটা প্রকাণ্ড বিলাসিতা, কিন্তু তোর পক্ষে প্রতিটি হাউসের প্রায় প্রত্যেকটি নতুন ফিল্ম্ দেখা দরকার—কখন কোত্থেকে মাথায় কী আইডিয়া আসে কে বল্তে পারে? আমার একজোড়া জুতোতেই প্রায় বছর চলে' যায়, কিন্তু তোর কতো জায়গায় যেতে

হয়, কতো লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, ভালো জামা-কাপড় না পরলে আমিই বা তোকে পাঁচ-জনের সামনে দেখাবো কী করে’? লজ্জায় আমার মাথাটাই তো কাটা যাবে।

মন্মথ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বল্‌লে,—তোর চাই আরাম, সুবিধে, আচারে-পোষাকে অভিজাত্য। তোর দাম কি আমি বুঝি না, বসন্ত? সংসারের জন্যে ভাবতে গেলে তুই লিখবি কখন? রবিঠাকুরকে রোজ দশটা-পাঁচটা করতে হ’লে আর নোবেল প্রাইজ পেতে হ’তো না। দেহে-মনে কতোখানি নিশ্চিন্ত হ’তে পারলে তবে একটা ভালো কবিতা বেরোয়। আমি কি কিছু বুঝি না ভাবিস্? সব বুঝি। নে, সময় নষ্ট করিস্ নে। আরম্ভ করে’ দে। মন্মথ ফের নামবার উদ্যোগ করলে।

পীড়িত মুখে বসন্ত বল্‌লে,—এই তোমাদের মাইনে সব টেন্-পার্সেণ্ট করে’ রিডাক্‌সান্ হ’লো—

—যা, যা, বাজে বকিস্ না। তোর যা কাজ, তাই তুই কর্। তার জন্যে আমাকে সাহায্য করবি ভেবে দু’হাতে যা-তা লিখে তোকে পয়সা কামাতে হ’বে না। পয়সা কিছু হাতে থাকে, বেশ তো, তা জমিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আয়, বই কেন্, বরং ঘরে একটা ফ্যান্ করে’ নে,—যাতে তোর লেখার সুবিধে হয়। কবিতার ভাব বা গল্পের প্লট ছাড়া মাথায় আর কিছু তোকে ঢোকাতে হ’বে না। সে-সবের জন্যে আমরা আছি। তুই তোর কাজ করে’ যা—

যেতে-যেতে হঠাৎ মন্মথ থামলো: তোর হাতে পয়সা-কড়ি আছে, ঘর-দোরের চেহারা দেখে তো তা মনে হয় না। বেড্-কভারটা ময়লা হ'য়ে গেছে, মাঝে-মাঝে জুতোয় দেখি তালি লাগাস্, টুইলের জামা গায়ে দিস্! ঘর-দোরের এ কী হাল-চাল? ছোট দেখে একটা চাকর রেখে দেবো?

সিঁড়ির মাঝ পথ থেকে মন্মথ আবার ফিরলো। চাপা গলায় বল্লে,—তোর বৌদির কথায় তুই কিছু মনে করিস্ না, বসন্ত। ও তো একটা character. তোর কোনো গল্পে ওকে চালিয়ে দিস্। জীবনে তোর বরং একটা অভিজ্ঞতা বাড়লো—কি বল্? আর না, এবার তুই লেখ্। এমন লিখবি যা পড়ে' সমস্ত দেশ অবাক্ হ'য়ে যাবে; আমরা সব জাঁক করে' বল্তে পারবো। অনেক কিন্তু রাত হ'য়ে গেলো,—আমি চল্লাম।

*

* *

নিচে মন্মথ নিজের শোবার ঘরে এসে দেখলো জ্যোতির্ম্ময়ী তখনো ঘুমোয়নি। একটু ঝাঁজালো গলায় বল্লে,—বসন্তর বিছানাটাও পেতে দিয়ে আস্তে পারো না? ঐ ঝিটাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে,—দু'বেলা ঘরটায় তার ঝাঁট দিতে কি হয়েছে?

জ্যোতির্ম্ময়ী খেঁকিয়ে উঠলো : কখন ঝাঁট দেবে ? সমস্তক্ষণ ঘর তো তালা-বন্ধই থাকে।

—থাকবে না ? খোলা থাকলেই তো বাঁদর ছেলেপিলেগুলো গিয়ে বই ঘাঁটবে, ছবি ছিঁড়ে আনবে, কোথাকার জিনিস কোথায় ছড়িয়ে রাখবে—ওর খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। সেই দিন শুনলাম এমনি ঘাঁটাঘাঁটিতে ওর একটা গল্পের দুটো পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে। পরে লিখলে কি আর তেমনি হয়—গল্পের সেই আবহাওয়াই তো তখন মাটি হয়ে গেলো। তা, তুমি তো গিয়ে বিছানাখানা রোজ পেতে দিয়ে আসতে পারো। মশারির কোণগুলি পর্য্যন্ত ছিঁড়ে গেছে দেখলাম।

জ্যোতির্ম্ময়ী বললে,—এতো বড়ো ধাড়ি ছেলে নিজে নিজের বিছানাখানা পেতে নিতে পারে না ?

—পারে, কিন্তু ঘরে এসেই যদি পরিপাটি করে' বিছানা পাতা দেখে ওর মন কেমন খুসি হয় বল তো ? চারদিক সব অগোছাল হ'য়ে আছে, সেই জন্যে ক'দিন থেকে ও কিছু লিখতে পারছে না। সাহিত্যিকমাত্রেই একটু পরমুখাপেক্ষী থাকতে ভালোবাসে—তুমি ওকে দেখলেই তো পারো।

—আমার তো খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই। জিনিসপত্রে একটু হাত দিলেই অমনিই তার সব-কিছু কেবল হারিয়ে যেতে থাকে। দায় পড়েছে তার বিছানা পেতে দিতে। কেন, একটা বিয়ে দিতে পারো না ? বিছানাটাও ঠিক মতো পাতা হ'বে, গুণধর তাড়াতাড়ি বাড়িও ফিরবেন।

মন্মথ একটা বিড়ি ধরালো। বল্‌লে,—পাগল! বিয়ে করলেই তো ও গেলো। ওর সাহিত্য তখন জলো, স্যাঁতসেঁতে হ'য়ে যাবে।

প্রবলকণ্ঠে কথা বলতে গিয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী বিছানার ওপর উঠে বসলো: মার্ অমন সাহিত্যের মুখে পঞ্চাশ ঝাঁটা! সারা জীবন ও এমনি পদ্য মেলাবে নাকি? বিয়ে করবে না?

—তা হয়তো করবে। কিন্তু তার কর্ত্তা কি আমি নাকি?

—তুমি নয় তো কে? তোমার কথায়ই তো ওঠে-বসে। দেখে-শুনে একটা পাত্রী জুটিয়ে কাঁধে চাপিয়ে দাও—টেরটি তখন পাবেন বাছাধন। আমাকে আর তা'লে এমনি রোজ রাত্রে ভাত বেড়ে বসে' থাকতে হয় না।

মন্মথ বিড়িতে টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে,—পাগল! জেনে-শুনে আমি ওর স্বাধীনতা নষ্ট করতে পারি নাকি?

জ্যোতির্ম্ময়ী বল্‌লে,—তাই বলে' সংসারে ও এমনি স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে বেড়াবে? এ বাবা কোন্ দিশি আদর! ভালোবেসে তো লোকে বিয়েই দিতে চায় জানি। না, তুমি ওর বিয়ে দাও। তবেই ওর দায়িত্ব বাড়বে, টাকা রোজগারের পথ দেখবে, পায়ের ওপর পা তুলে আর এমনি আমিরি করা চলবে না।

মন্মথ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে,—না।

—না কী! আমার জানা-শোনা ঘরের এক মেয়ে আছে—ঠাকুরপোকে দুদিনেই সায়েস্তা করে' দেবে। তার হাতে পড়লে উড়্‌নচণ্ডির হাল্‌খানা যা হবে,—তুমি সেই মেয়েকে পছন্দ

করে' এসো। নাম মণিমালা, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ছে। কেন? নামে তো খাসা কবিত্ব আছে, অপছন্দটা কোন্‌খানে? তোমার গুণধর ভাই কি সারা জীবন নিরামিষ থাকবে নাকি ভেবেছ?

—কিন্তু তাই ব'লে' অভিভাবক হ'য়ে তার জন্যে যাকে-তাকে ধরে' আনতে পারি না। ও যদি কোনোদিন বিয়ে করেই, নিজের থেকে করবে, প্রেমে পড়ে' করবে, বা প্রেমে ব্যর্থ হ'য়ে করবে। তার জন্যে আমাদের ব্যস্ত হ'লে চলবে না। এ তো আমার-তোমার মতো আটপৌরে বিয়ে নয়,—এ তুমি ঠিক বুঝবে না। মন্মথ আরেকটা বিড়ি ধরালো।

জ্যোতির্ম্ময়ী বললে,—বাপের জন্মে এমন কথা কখনো শুনিনি বাপু।

—কী করে' শুনবে? বসন্ত যে আমার-তোমার মতো অনেকের চেয়ে একেবারে আলাদা। ওর জন্যে পাত্রী আনতে হ'বে না, সে নিজে থেকে একদিন আসবে। তাকে আমি-তুমি ঠিক চিনতে পারবো না, চিনবে খালি বসন্ত। আমরা খালি প্রতীক্ষা করে' থাকবো:

জ্যোতির্ম্ময়ী ঠোঁট উলটিয়ে বল্‌লে,—তা'লেই হয়েছে। তোমার ভাইও তা'লে আর বিয়ে করেছেন। স্বভাব-চরিত্রের যা মতি-গতি, কোন্‌ দিন যে কি কাণ্ড করে' বসেন তার ঠিক নেই। এমনি তো পাঁচজনের মুখে-মুখে কতো কথা ভেসে বেড়াচ্ছে। রাত বারোটা-একটার আগে তো কোনোদিন বাড়ি ফেরেন না।

মন্মথ দীপ্ত কণ্ঠে বললে,—পাঁচজনের কথায় তুমি-আমি কান পাততে পারি, কিন্তু বসন্ত তা কেয়ার করে না। তুমি-আমি চরিত্রের কী বুঝি বলো? কতোটুকু আমাদের জ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা! কবির কাছে চরিত্রের আলাদা অর্থ, আলাদা মানদণ্ড। তুমি-আমি সাদা ভাষায় যাকে চরিত্র বলি, সেটা কবির কাছে নৈতিক দুর্ব্বলতা, আত্মবিকাশের বাধা। দৃষ্টি খুব বড়ো না হ'লে আমরা তা সহজে বুঝতে পারবো না।

জ্যোতির্ম্ময়ী বললে,—বুঝে আমাদের কাজ নেই। কিন্তু এই যে বস্তি নিয়ে সব নোংরা গল্প লেখে, ও সেখানে যায় না ভেবেছ? না-গেলে সব কথা খুঁটিয়ে অমনি লেখে কী করে'?

মন্মথ হেসে বললে,—গেলোই বা। জীবনের অভিজ্ঞতার জন্যে কোথায় না ওর যেতে হ'বে! চরিত্রসৃষ্টির জন্যে কতো লোকের সঙ্গে ওকে মিশতে হবে, কতো জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'বে,—সংসারে মহৎ ও জঘন্য দুই নিয়েই ওর কারবার। এতে পাঁচজনের নালিশ করবার কী আছে? যে সত্যিকারের প্রতিভাবান, সে সমস্ত কিছুর ওপরে—তা তোমার নীতিই বলো, আর শ্লীলতাই বলো।

—আহা, কী একখানা কথাই বললে! পড়ো দেখি ওর সেই 'ভগবানের কান্না' বলে' গল্পটা? মা-বোনের সামনে বসে' পড়া যায়?

—মা-বোনের সামনে বসে' পড়বার জন্যে তো ও সেটা লেখেনি। লিখেছে একলা বসে' পড়বার জন্যে। কিন্তু এ নিয়ে

তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। এইবার চুপ করে' ঘুমোও। এখানে গোলমাল হ'লে ওর লেখার ব্যাঘাত হ'তে পারে। ও এখন লিখছে। সাহিত্যিকের জীবনে একেকটা মুহূর্ত্ত অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

জ্যোতির্ম্ময়ী বললে,—অথচ মৃন্ময়ীর বিয়েতে কিছুতেই একটা পদ্য লিখে দিলে না।

মন্মথ চুপ করে' গেলো। বসন্তর লিখিত অক্ষরের মতো মুহূর্ত্তগুলি রাত্রির পৃষ্ঠার ওপর দিয়ে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছে।

জ্যোতির্ম্ময়ীর জিহ্বা বারণ মানছে না : আর শোনো, শিগগিরই মেজদি ছেলেপিলে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসছেন। ওপরের ঘরটা ওকে কয়েকদিন ছেড়ে দিতে বলো—দিন কতক মেস্এ গিয়ে যেন থাকে।

মন্মথ বললে,—অসম্ভব। মেজদি নেহাৎ এলে নিচে এখানে-ওখানেই যা হোক করে' জায়গা করে' নিতে হ'বে। তার জন্যে ওর অসুবিধে করতে পারবো না।

জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষেপে উঠলো : কেন, অমন ভালো ঘরটা ওই বা কেন পাবে? ছেলেপিলে নিয়ে ঠাণ্ডায় এখানে আমি কুঁকড়ে মরবো?

—এ-কথা কতোবার বলবো তোমাকে? লেখবার জন্যে নিরিবিলি একখানি ঘর চাই, রাস্তার গোলমালের জন্যে দূরে, আকাশের খানিকটা কাছে। জানলা খুললেই অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছুতে না পারলে লেখার মধ্যে মন ছাড়া পায় না,

ভাবগুলি কেমন সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসে। এখন ভাবো দিকি একবার, সব চুপচাপ, চারদিক থেকে অন্ধকার আকাশ ওকে ঘিরে আছে, আর কেমন নির্ভাবনায় ও লাইনের পর লাইন সাজিয়ে চলেছে! কালকের বাজারের ফর্দ্দ যদি ওকে ভাবতে হ'তো, তা'লে কী হ'তো বলো দিকি?

গলা উঁচিয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী বললো,—তাই বলে' ঐ লাগোয়া ছাতটাও ওকে ছেড়ে দিতে হ'বে নাকি?

—বা, লিখতে-লিখতে মাঝে-মাঝে যে ওকে অস্থির হ'য়ে উঠে পড়তে হয়। প্রকাশের উত্তেজনায় সারা শরীর ওর ছটফট করতে থাকে—তখন ভাবগুলিকে মনের মধ্যে গুছিয়ে নেবার জন্যে ও ছাতে পাইচারি করে। একটি মাত্র কথার জন্যে ওর প্রকাণ্ড একটা গল্প হয় তো কখনো আটকে থাকে—তখন খোলা ছাতে হেঁটে-হেঁটে ওপরের অন্ধকারে সেই একটি কথা ও খুঁজে বেড়ায়। হারানো মুখের মতো তা একবার এক সময় অতিপরিচিত হ'য়ে মনে ভেসে ওঠে।

জ্যোতির্ম্ময়ী শুয়ে পড়লো। মুখ বেঁকিয়ে বললে,—আহা, তবু যদি কেউ ভালো বলতো! কী লেখাই যে লিখছেন! আর তার জন্যে গোবর্দ্ধন মরছেন খেটে!

মন্মথ বললে,—নিন্দে-প্রশংসায় লেখকের কী আসে যায়! ও দুটোই সাময়িক বিকার! আর, বসন্ত যাতে এইখানেই না থেমে যায় আমি সর্ব্বস্ব পণ করে' তো তারই চেষ্টা করছি। তাকে আরো লিখতে হ'বে, আরো ভালো লিখতে হ'বে, সমস্ত জীবন

লিখতে হ'ব। যাতে তার এই লেখার প্রবৃত্তিতে কখনো এতোটুকু না মর্চে পড়ে তার জন্যে আমি তাকে সংসারে নির্লিপ্ত, সন্ন্যাসী করে' রাখতে চাই। তার জন্যে আমি খাটবো না, তবে আর তার আছে কে? আমি ছাড়া কে আর তার স্বার্থ বুঝবে? আর, ও বড়ো হ'লে সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও তো বড়ো হ'য়ে গেলাম। আমরাও তখন ওর পিছে-পিছে পৃথিবীতে পরিচিত হ'তে পারবো। বুঝলে,—তুমিও একটু ওর সুখ-সুবিধে দেখো। ওকে এখন এক পেয়ালা চা করে' দিয়ে এসো না? লিখতে-লিখতে যখন মাঝে-মাঝে ফাঁক পড়ে, তখন এক-আধ চুমুক চা পেলে ওর খুব ভালো লাগবে।

ঘুমো চোখে জ্যোতির্ম্ময়ী বললে,—আমার বয়ে' গেছে।

মন্মথও শুলো, কিন্তু চোখে এক ফোঁটা ঘুম এলো না। বসন্ত যখন শরীরের সমস্ত স্নায়ু-শিরা উচ্চকিত করে' নিষ্ঠুর প্রকাশ-হীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তখন সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোয় কী করে'?

বসন্তকে কোলে রেখেই তাদের মা মারা গেলো। জেগে-জেগে সব কথা মন্মথ মনের মধ্যে এখন উলটে-পালটে নিচ্ছে—মন্মথর বয়স তখন আট। তারপর সতেরো বছর বয়সে তার চাকরিতে প্রথম বসতে-না-বসতেই বাবা তার কাঁধে সমস্ত সংসার ফেলে সরে' পড়লেন। বসন্ত তখন ইস্কুলে পড়ে, দুটি বোন বিয়ের উপযুক্ত। বোন দুটিকে সে পাত্রস্থ করলে; বসন্ত দাদার ছায়ায় বসে' এম-এ পাস করলো। কতো দিনের কতো পুরোনো সব কথা।

ইস্কুলে থেকেই বসন্ত কবিতা লেখে—এখন সে বাঙলা দেশে একজন নামজাদা সাহিত্যিক। মন্মথ কোনোদিন তার সাহিত্য-সাধনায় বাধা তো দেয়ই নি, বরং তাতে অনুকূল উৎসাহ সঞ্চার করেছে। যখন যা সে চায়, যাতে তার খেয়াল হয়, যা করে' তার সাহিত্যিক বৃত্তি স্ফূর্তি পায়—মন্মথ কোনোদিন তাতে এতোটুকু কৃপণতা করেনি। অপমানুষের দলে একমাত্র মানুষ, সমালোচকের মধ্যে স্রষ্টা। কী মানুষে করে তাতে তার দাম নয়, কী সে সৃষ্টি করে তাতেই তার মাহাত্ম্য। বসন্ত সৃষ্টিকর্ত্তা।

এখনো বসন্ত এমন কিছু লেখেনি যাতে তার পরিচয়ের পরিধি সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'তে পারে। কিন্তু কতোই বা তার বয়স? তার জন্যে চাই তার অখণ্ড অবসর, লৌকিক দায়িত্বহীনতা, চাই আধ্যাত্মিক দুঃখের সঙ্গে অজস্র আরাম। বৃষ্টিস্নিগ্ধ আকাশের মমতা না পেলে সে মরুভূমির কথা লিখবে কি করে'? মন্মথ জীবনে তাকে সেই মুক্তি দেবে, সেই মুক্তিতেই তার প্রতিষ্ঠা। বায়স্কোপের পর্দ্দায় লোকে নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন ছবি দেখে চমৎকৃত হ'বে, নেপথ্যের সমস্ত ক্লান্তিকর আয়োজন বহন করবে একা সে, মন্মথ। দেহপাত করবে মন্মথ, যাতে বসন্ত আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখের স্বাদ সংসারে পরিবেষণ করতে পারে।

এখনো সে ততো ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে পারে নি, কিন্তু একমাত্র শ্রমই হচ্ছে প্রতিভার পরিচয়। বসন্ত নিদারুণ পরিশ্রমী, অসীম অধ্যবসায়ী। সে একদিন সেই যশসূর্য্যলোকে উত্তীর্ণ হ'বে—ভাবতেও মন্মথর সমস্ত গা আনন্দে রোমাঞ্চিত হচ্ছে! কবির

জীবনে একটিমাত্র মুহূর্ত্ত, তাকে কয়েকটি আখরে অবিনশ্বর করে’ রাখাই তার কাজ। সেই অমর মুহূর্ত্তেই কবি চিরজীবী। আজ রাত্রে বসন্তর জীবনে সেই মুহূর্ত্ত আবার এসেছে। এই মুহূর্ত্ত মন্থন করে’ কী অমৃত সে উদ্ধার করবে কে জানে! মন্মথ চঞ্চল হ’য়ে উঠলো। হয় তো আজ যা ও লিখবে সময়ের শত-লক্ষ ঘাত-প্রতিঘাতেও তা মুছে যাবে না।

কিন্তু এইখেনেই থামলে চলবে না। তাকে আরো লিখতে হ’বে, আরো ভালো লিখতে হ’বে, চিরজীবন লিখতে হ’বে।

তাকে মন্মথ থামতে দেবে না।

কোথাকার ঘড়িতে ঢং-ঢং করে’ তিনটা শব্দ করে’ উঠলো। আরো এক ঘণ্টা। তারপরেই বসন্তর গল্প তৈরি। কোন জীবন থেকে এক টুক্‌রো রহস্য না-জানি সে উদ্‌ঘাটিত করছে! সে জীবন কী, বা কা’র, কিছু এসে যায় না, দেখতে হ’বে সে জীবন বিশ্বজনীন কি না, দেখতে হ’বে সে জীবন জীবন্ত কি না, দেখতে হ’বে সে-জীবনে বসন্ত মৃত্যুকে পরাভূত করলো কি না।

চারটে বাজতেই মন্মথ উঠে পড়লো। টিপি-টিপি পা ফেলে খিল খুলে চোরের মতো চুপি-চুপি সে ওপরে উঠতে লাগলো। বসন্তর ঘরে আলো জ্বলছে। এখনো সে লিখে চলেছে বুঝি! না, তাকে সে বিরক্ত করবে না—মন্মথ কি পাগল হয়েছে? এ-পাশের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে তার এই লিখন-ন্যস্ত অভিনিবেশটি সে দেখবে। ক্ষীণ একটু দৃষ্টি-সঙ্কেতে মন্মথ তার অজস্র আশীর্ব্বাদ বসন্তর লেখনীর মুখে পৌঁছে দেবে মাত্র।

দরজাটা খোলা—মন্মথ অবাক হ'য়ে গেলো—বসন্ত তার বুকের ওপর লেখবার প্যাডটা চেপে ধরে' কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কলমটা আঙুল থেকে খসে' পড়েছে,—প্যাডের প্রথম পৃষ্ঠাটা নীরব, অলিখিত, একেবারে সাদা, চিহ্নহীন্। কোথাও এই মুহূর্ত্তের এতোটুকু রঙ লাগে নি। নিষ্ঠুর সংসার অকারণে ক্ষণকালের জন্য অনধিকার প্রবেশ করে' সেই দুর্লভ, বিরল মুহূর্ত্তটিকে হত্যা করে' গেছে।

ছায়া

ইংরিজি-সাহিত্যে অনার্স নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে বি-এ পড়ছে, নাম ঊর্মিলা, দেখতে বাঙালি মেয়ের পক্ষে সুন্দরীই বলতে হ'বে—যদি অবিশ্যি সৌন্দর্য্য রূপে না হ'য়ে রেখায় হয়, বর্ণে না হ'য়ে হয় লাবণ্যে—বেশ নম্র, মিতভাষী ; কথায়-বার্ত্তায় উজ্জ্বলতা আছে, উগ্রতা নেই ; এতোখানি লেখা-পড়া শেখা তার ব্যর্থ হয় নি।

ভাইয়ের জন্যে কল্‌কাতা থেকে মেয়ে দেখে এসে ব্রজেনবাবু মা ও স্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দিচ্ছিলেন। হিমাদ্রি পাশের ঘরে বসে' কান খাড়া করে' শুনছিলো।

এক পিঠ ঘন চুলের ঢেউ, হ্রস্বতার লজ্জা ঢাকবার জন্যে খোঁপা বেঁধে কাঁটা গুঁজে আসে নি ; পাছে হাঁটিয়ে দেখাতে হয় সেই ভয়ে লম্বা বারান্দার একেবারে এক প্রান্তে মেয়ে-দেখার জায়গা করা হয়েছিলো—নিজেই মেয়েকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ পা হেঁটে আসতে হয়েছে—বেশ সাবলীল, অকুণ্ঠিত তার চলা ; গান গাইতে বলার পর সে আধুনিক বিকৃত রুচির গজল-ঠুংরি না গেয়ে দিব্যি স্বদেশী গান ধরলো দানাদার দরাজ গলায়—ব্রজেনবাবু মেয়েটির করতল দু'টিও সম্পূর্ণ অনুভব করে' এসেছেন—কোথাও এতোটুকু কর্কশ ঠেকলো না। চমৎকার মেয়ে, ফার্ষ্ট-রেইট্‌ মেয়ে।

তার আরো কারণ ছিলো। তাঁরা জানেন প্রতিযোগিতার যা বাজার, বিয়ের পণ তাঁদের দিতেই হবে। এখন সকল ঘরেই মেয়েরা লেখা-পড়া শিখছে, বাঙালি মেয়ের সৌন্দর্য্যের

যেটুকু স্বাভাবিক ত্রুটি, বিত্থাচর্চার রঙিন মোহ দিয়ে তা সাম্‌লে না নিলে চলছে না। সবায়েরই ঘরে যখন এই অবস্থা, তখন টাকার কথা তেমনি এসে যাচ্ছে। সাপ্লাই-এর বাজারে তারতম্য ঘট্‌ছে না বলে'ই এটা আর উঠ্‌লো না। আপাততো ব্রজেনবাবুদের পক্ষে তা ভালোই—হিমাদ্রির বিলেত যাওয়ার খরচ দিতে তাঁরা রাজি। হিমাদ্রির একটা পি-এইচ-ডি হ'য়ে আস্‌তে-আস্‌তে উর্ম্মিলা এম-এটা পাশ করে' নিতে পারবে। তার জন্যেও ব্রজেনবাবুদের ভাবতে হ'বে না।

আর এই তার হাতের লেখার নমুনা। হস্তলিপি যে কতো বড়ো চরিত্র-নির্ণেতা সেই বিষয়ে ব্রজেনবাবুর সন্দেহ নেই। প্রতিটি অক্ষর নিটোল, পরিস্ফুট—অক্ষরের প্রতিটি রেখায় চিত্তের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে! বি-এ পড়ছে মেয়ে—বানান-ভুল হ'বে কেন, কিন্তু প্রত্যেকটি সুগঠিত অক্ষরে,পারস্পরিক সমান্তরাল ব্যবধানে, সরল সুসম্বদ্ধ লাইনে, সর্ব্বোপরি নির্ম্মল পরিচ্ছন্নতায় তার উদারতা ও প্রসন্নতা, সেবা ও দাক্ষিণ্য সূচিত হচ্ছে। কবিতায় যেমন দেখতে হয় ছন্দ নয়, ভঙ্গি; নাটকে যেমন দেখতে হয় ক্রিয়া নয়, আবহাওয়া; গানে যেমন দেখতে হয় সুর নয়, প্রকাশ; তেমনি মেয়ে-নির্ব্বাচনের বেলায় দেখতে হয় রূপ নয়, পরিবার। সে-দিক দিয়েও উর্ম্মিলা ফার্ষ্ট-রেইট্‌।

বৌদিদি উর্ম্মিলার হাতের লেখার নমুনাটি হিমাদ্রির চোখের তলায় এনে ধরলেন। হিমাদ্রি কাগজের টুকরোটাকে পেপার-ওয়েইট্‌ দিয়ে চাপা দিলে। বৌদিদির সঙ্গে অন্য সব মামুলি

রসিকতার ফাঁকে হিমাদ্রি যে-মতটা কঠিন গলায় জাহির করলে, বল্‌তে কি,—তার মধ্যেও কোনো মৌলিকতা নেই। গলায় জোর থাকলেই মতের মূল্য বাড়ে না। হিমাদ্রি বল্‌লে,—যে-মেয়ে বিজিত হ'বার অপেক্ষা না রেখে নিজে এসে সেধে বশ্যতা স্বীকার করে, তার প্রতি আমার রুচি নেই। দাদাকে ব'লো, বিনা দামে কোনো সম্পদই আমি লাভ করতে চাই না।

এমন কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সকল ছেলেই বলে' থাকে এবং তারাই কালক্রমে স্ত্রীর কথায় ওঠ্-বোস্ করে—বৌদিদি অনেক দেখেছেন, আরো কত দেখবেন। তাই সারা শরীরে চাপা হাসির একটা ঢেউ তুলে বৌদিদি অন্তর্হিত হ'লেন,—কাগজের টুকরোটা হিমাদ্রির টেবিলের উপর তেমনি পড়ে' রইলো।

অবিশ্যি কাগজের টুকরোটা তুলে মেয়েটির হাতের লেখায় চোখ বুলিয়ে নিলেই বিবাহ-সম্বন্ধে হিমাদ্রির কঠিন মতটা ফিকে হ'য়ে যাবে না। যাই বলো, হাতের লেখাটি সুন্দরই বলতে হ'বে—যদিও মুক্তোর সারের সঙ্গে তুলনা দেওয়াটা বাড়াবাড়ি। দু'রকম নমুনা দেওয়া আছে—ইংরিজি আর বাঙলা। ইংরিজিতে হচ্ছে ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতার চারটি লাইন—যেখানে প্রোটিসেলিয়াস্ তার স্ত্রীকে কামনাকুলতা সংযত করতে বল্‌ছে, কেন না দেবতারা প্রেমের গভীরতা ভালোবাসেন, শরীরের উত্তাপকে নয়। কোটেশান্‌টা পড়ে' হিমাদ্রি গোড়ায় প্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলো, বিশেষ এই লাইন-চারটিকে উদ্ধৃত করার হেতু খুঁজে না পেয়ে; কিন্তু চট্ করে' তার মনে পড়ে'

গেলো ওয়ার্ডসোয়ার্থের ঐ কবিতাটা গেলো-বছরে আই-এ পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য ছিলো। একটা-কিছু কারণ তা হ'লে আছে। হিমাদ্রি মনে-মনে হেসে কাগজটা উল্‌টোলো; দেখা যাক্ বাঙলায় সে কোন্ কবিকে ধন্য করেছে। ঈশ্বর গুপ্ত না রবীন্দ্রনাথ! (তুইই তাদের পাঠ্য।) পৃষ্ঠা উল্‌টে হিমাদ্রি অবাক হ'য়ে গেলো,—কোনো কবিতা থেকে উদ্ধৃতি নয়, স্বরচিত কোনো ভাবগর্ভ বাণী নয়—টানা ডাগর অক্ষরে খালি নিজের নামটুকু—উর্ম্মিলা। নিতান্তই সে যে শ্রীমতী, বা নিতান্তই সে যে বিশেষ কোনো গোত্রান্তর্ভুক্তা তার এতোটুকু পরিচয় নেই—শুধু সে উর্ম্মিলা।

অক্ষর থেকে হিমাদ্রি সহজে চোখ ফেরাতে পারলো না। বাঁকা-চোরা রেখার প্রতিটি বঙ্কিমা অপরিস্ফুট ইঙ্গিতের মতো তার মনে হ'তে লাগলো। যেন ঐ অক্ষর তিনটিতে উর্ম্মিলার সমস্ত যৌবন অলক্ষ্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। বাঙলা লিখতে এসে সে আর প্রোটিসেলিয়াস্-এর উপদেশ মনে করে' সংযত, স্তব্ধ থাক্‌তে পারে নি, সামান্য তিনটি অক্ষরে তার কামনার সমুদ্রকে উদ্বেল, উন্মুখর করে' দিয়েছে। বাঙলা লিখতে হ'বে মনে করে' সে আর অপরিচয়ের দূরত্ব রাখলো না, গোপনে কখন হৃদয়ের প্রতিবেশিনী হ'য়ে উঠলো। সাদা প্রকাণ্ড পৃষ্ঠাটায় শুধু লেখা উর্ম্মিলা—যেন এইমাত্র দীর্ঘ চিঠি শেষ করে' ইতিতে সে শুধু তার নামটি লিখে দিয়েছে। চিঠির কী সে ভাষা হিমাদ্রি তা যেন এক নিমেষে পড়ে' উঠলো।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, চাকর ঘরে আলো দিয়ে যায়নি। অক্ষর আর স্পষ্ট দেখা যায় না—কিন্তু কাগজের থেকে চোখ তুলে চাইতেই হিমাদ্রি দেখতে পেলো অক্ষর তিনটি তার সামনে একটি প্রত্যক্ষ, প্রাণবন্ত নারীমূর্ত্তিতে লীলান্তরিত হ'য়ে উঠেছে। অথচ কী যে তার রূপ, বা রঙ, বেশ, বা বয়স, কিছুই স্পষ্ট ধারণা হ'লো না—স্তিমিতগতি নদীধারার মতো কয়েকটি রেখার ঢেউ মুহূর্ত্তে আবার ভেঙে-ভেঙে ছিটিয়ে পড়লো,—ঘর জুড়ে অন্ধকার দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে।

ঐ পর্য্যন্তই। তাই বলে' সেই রেখার টুকরোগুলো কুড়িয়ে একত্র করে' ঊর্ম্মিলাকে স্থূল, মাংসল করে' তুলে একেবারে নিঃশেষ-আয়ত্ত করে' ফেলতে হ'বে—হিমাদ্রির রুচিতে তা বাধলো। প্রবলকণ্ঠে বিয়েতে সে অসম্মতি জানালে।

যুক্তিগুলোও তার আধুনিক কালের অনুকূল নয়। যে মেয়েকে সে বিয়ে করবে তাকে সে নিজে নির্ব্বাচন করবে, সৃষ্টি করবে,—রূপের রীতিবিচারটা তার কাছে আলাদা রকম। আর, বিলেত যদি সে যেতেই চায়, তবে নিজেই যেতে পারে ইচ্ছা করলে—বাবা সেই জন্যে তার অংশে মোটা টাকা রেখে গেছেন। নিজের স্ত্রীর জন্যে অন্যের রুচির উপর নির্ভর করা ও বিলেত যাওয়ার জন্যে শ্বশুরের টাকার মুখাপেক্ষী হওয়া—দুটোই সমান অপমানকর।

এমন মূর্খও কি না কেউ আছে। বেশ তো, নিজেই হিমাদ্রি ঊর্ম্মিলাকে দেখে আসুক না। ছি ছি, ভাবতেও

ঘৃণায় হিমাদ্রির গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। শাখাপত্রবহুল অরণ্যের ফাঁকে চন্দ্রোদয়ের ভিতর রমণীয় একটি যাদু আছে, কিন্তু দিগন্ত-উন্মুক্ত উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের ওপর নিরাবরণ পূর্ণিমায় আছে প্রগল্‌ভ নির্লজ্জতা। সেই যে ঊর্ম্মিলা বহুবসনে কুণ্ঠিতা হ'য়ে তার সামনে চোখ নামিয়ে বসবে—তার সেই উপস্থিতিটা অতিমাত্রায় স্থূল, অতিমাত্রায় শরীরী, অতিমাত্রায় অপরিচ্ছন্ন। যতোক্ষণ হিমাদ্রি কিছু কথা না কইবে, ততোক্ষণ সে মুখ তুলবে না—সেই কৃত্রিম, কঠোর স্তব্ধতায় একটা আবরণহীন কদর্য্যতা থাকিবে,—সে-স্তব্ধতা অতিমাত্রায় মুখর, তার অর্থ অতিমাত্রায় স্পষ্ট, রূঢ়, অবারিত। এই অপমান ঊর্ম্মিলাকে না করলেও হিমাদ্রিকে দংশন করছে। তার চেয়ে ভাঙা-ভাঙা পরিচয়ের ফাঁকে ঊর্ম্মিলাকে যদি সে দেখতে পেতো, তা হ'লে তার সেই অটল, উলঙ্গ স্তব্ধতার ওপর চুপে-চুপে নামতো একটি অসম্পূর্ণ হাসি, মুহূর্ত্তে সে কাঠিন্য হ'তো স্বচ্ছ, স্তব্ধতা তখন মাত্র শারীরিক উপস্থিতি হ'য়ে থাকতো না, তখন তা হ'তো গভীর হৃদয়ানুভূতির নামান্তর।

অতএব ঊর্ম্মিলাকে নিয়ে ব্রজেনবাবুর সঙ্গে হিমাদ্রির একটা বচসা হ'য়ে গেলো। এবং তারই ধাক্কায় হিমাদ্রি ছিট্‌কে পড়লো একেবারে বাইরে—নিরাত্মীয় লোকারণ্যের মাঝে। হাত-পা তাঁর ফাঁকা, কোথাও এতোটুকু ঠেক্‌লো না। মা দাদার সংসার তদারক করছেন, তাঁর প্রতি দায়িত্ব হিমাদ্রির কম—সঙ্গে খালি তার ব্যাঙ্কের দরকারি কাগজগুলি রইলো।

নিজের পয়সায় বিলেত সে অনায়াসে চলে’ যেতে পারে বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, জীবনে হিমাদ্রির বিশেষ কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। উদ্দেশ্যহীন অভিযানে যে প্রখর-রোমাঞ্চময় উচ্ছৃঙ্খলতা আছে হিমাদ্রির স্নায়ু তা সইতে পারে না—এই যে সে পরিবারের সঙ্গে সামান্য বিদ্রোহ করলো তাতেও কোথাও যেন একটু ছন্দচ্যুতি ঘটলো। তবুও কলহ-কোলাহলের বাইরে এই অপরিমিত নির্জ্জনতার মোহ হিমাদ্রিকে ধীরে-ধীরে আচ্ছন্ন করে’ ধরলো। কিন্তু কী যে এখন সে করে কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

এমন সময় তার কানে এলো বহরমপুরে গঙ্গার ধারে সুন্দর একখানি বাড়ি বিক্রি হচ্চে। বাড়ি যদি করতেই হয়, কল্‌কাতায়—লেক-পটিতে, তা না করে’ কি না বহরমপুরে—জলজ্যান্ত ম্যালেরিয়ার জঙ্গলে! হিমাদ্রির রুচিই আলাদা—কল্‌কাতা তার ভালো লাগে না। শিরদাঁড়া খাড়া রেখে সব সময়ে সেই যে প্রস্তুত হ’য়ে বসে’ থাকা—ঐ ভঙ্গিটাই তার কাছে বিশ্রী লাগে। মফঃস্বলের নিরিবিলি সহরে দিব্যি সে গা এলিয়ে বসে’ বিশ্রাম নিতে পারবে। ছোটার ব্যস্ততা নেই, ভদ্র সাজবার উগ্র সমারোহ নেই, অনর্থক শ্রান্তি ও তার ক্লান্তিকর অপনোদনের প্রয়াস নেই—সেখানকার প্রতিটি মুহূর্ত্ত মন্থর, ঘন, স্পর্শ-সহিষ্ণু।

মোট কথা, হিমাদ্রি তখন বেলডাঙায় এক বন্ধুর বাড়িতে প্রাথমিক আশ্রয় নিতে এসেছিলো, এক ফাঁকে বহরমপুরে

গিয়ে বাড়িখানা সে দেখে এলো। গোরাবাজার ছাড়িয়ে আরো পশ্চিমে ঠিক গঙ্গার ওপর ছোট একতলা একখানা বাড়ি, পেছনে প্রকাণ্ড বাগান এবং তার পরেই ঘন বন চলে' গেছে। বাড়ির মালিক মোটে পাঁচ শো টাকায় তা ছেড়ে দিচ্ছেন। কল্‌কাতায় কোনো উঁচু-দরের হোটেলে ছ'মাস কাটাতে গেলেই পাঁচ শো টাকা বোঁ করে' বেরিয়ে যেতো। ধরা যাক্‌, এ-টাকাটা সে ব্যবসা করে' উড়িয়ে দিলে। এ-টাকার জন্য কাউকে জবাবদিহি দিতে হ'বে না। এবং নিতান্তই এ-ব্যবসায় সে ঠকছে কি না তা কে বলতে পারে।

সেখানে দু'টি পুরো দিনও তার মন টিকবে না—এই বলে' বেলডাঙার বন্ধু তাকে নিরস্ত করতে চাইলো। না আছে একটা লোক, না বা একটা প্রতিষ্ঠান। উত্তরে হিমাদ্রি বললে, লোক বল্‌তে সে একাই যথেষ্ট, আর প্রতিষ্ঠান বল্‌তে উন্মুক্ত প্রান্তর ও নিঃশব্দচারিণী গঙ্গা আছে। সম্প্রতি এর বেশি কিছু আর সে চায় না। আর যেটুকু সে বন্ধুকে বল্‌লে না—তা হচ্ছে এই—এই অসীমপরিব্যাপ্ত নির্জ্জনতায় বসে' সে একমনে তার প্রথম প্রেমের প্রতীক্ষা করবে।

বাড়িটা পাকাপাকি হস্তান্তরিত হ'বার আগে দুয়েকজন শুভানুধ্যায়ী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে আনাগোনা সুরু করলে। তাদের বক্তব্যটা হচ্ছে এই যে বাড়িটা প্রেতগ্রস্ত—সাবেক যে মালিক ছিলো, বাড়িটা বন্ধক রেখে মেয়ের বিয়ের জন্যে হাজার তিনেক টাকা ধার করে, বরপক্ষীয়দের দাবি উত্তরোত্তর

এতো বৃদ্ধি পেতে লাগলো বন্ধকি কর্জ্জে তা কুলিয়ে উঠলো না। এখন উপায়? উপায় অবিশ্যি একটা হলো।

হিমাদ্রি কৌতূহলী হ'য়ে জিগ্‌গেস করলে: কি?

—বর্ষায় গঙ্গা তখন ভরা, এ-পারে ও-পারে উত্তাল জল। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভদ্রলোক বলতে লাগলেন: মেয়েটি সেই জলে ডুব দিলে, আর উঠলো না।

—তার মানে, যখন উঠলো তখন সে মরে' গেছে। আত্মহত্যা করলো। বাঙালি কুমারীর পক্ষে এটা আর এমন কি অস্বাভাবিক? আত্মহত্যা করে' কৌমার্য্য রক্ষা করলো! এতে বিচলিত হ'বার আছে কী?

—আছে। ভদ্রলোক চেয়ারে গ্যাঁট হ'য়ে বসলেন; বল্‌লেন,—সেই থেকে তার প্রেতাত্মা ও-বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—বলেন কি? হিমাদ্রি খাড়া হ'য়ে উঠে বসলো: তাকে দেখা যায়?

—অনেকেই দেখেছে শুনেছি। মেয়েটির বাবা অবিশ্যি ধার শোধ করে' বাড়ি ছাড়াতে পারেন নি, যিনি বন্ধক নিয়েছিলেন তিনিই সপরিবারে এ-বাড়িতে বাসা তুলে আনলেন। দু'দিনও টিকতে পারলেন না। পরে বাড়ির জন্যে ভাড়াটে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। দু'একজন জুটলোও, কিন্তু কয়েক দিন থেকেই আবার পালালো। আজ বছর তিনেক ধরে' বাড়িটা অমনি খালি পড়ে' আছে—খদ্দের একটাও জোটাতে পারে

নি। কিছু গলদ না থাকলে অতো সুন্দর বাড়ি কি আর কেউ পাঁচ শো টাকায় ছাড়ে?

হিমাদ্রি চিন্তিত হ'বার বিন্দুমাত্র ভাণ না করে' বল্‌লে,—সেই মেয়েটিকে আপনারা কেউ দেখেছেন? কেন আসে সে? বলে কী?

ভদ্রলোক বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—তা যান্, নিজে গিয়েই দেখুন না একবার।

ভদ্রলোকের সঙ্গীটি বল্‌লেন,—মেয়েটির বিয়ে হচ্ছিল না বলে' মনের দুঃখেই বলুন আর সমাজকে শিক্ষা দেবার জন্যেই বলুন, আত্মহত্যা করে নি। মোট কথা, ওর স্বভাবে কিছু দোষ ছিল,—কা'কে নাকি ভালোবাস্‌তো, তাকে পায় নি বলে'ই এই ঘোরতর পাপ করে' বস্‌লে—

হিমাদ্রি বল্‌লে,—যাই হোক্, সে যে আত্মহত্যা করেছে সে-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'লাম। কেন সে তা করলো তা তার নিজের মুখের থেকেই শোনা যাবে। আপনারা ব্যস্ত হ'বেন না।

ভদ্রলোক যাবার মুখ করে' বল্‌লেন,—আপনার ভালোর জন্যেই বলছিলাম।

হিমাদ্রি নির্লিপ্ত স্বরে বল্‌লে,—আর আপনাদের ভালোর জন্যেই তো আপনাদের এখন চলে' যেতে বলছি।

*

*　　　　*

তারপর সত্যিসত্যিই যখন হিমাদ্রি নতুন বাসায় উঠে এলো, তখন স্থানীয় লোকেরা দল বেঁধে পালা করে' তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা কর্‌লে। হিমাদ্রি বল্‌লে,—বাড়িটা যখন কিনেই ফেলেছি, তখন ব্যবস্থা তো একটা করতেই হ'বে। অদানে-অব্রাহ্মণে তো যেতে দিতে পারি না।

—কিন্তু আপনি একা মানুষ, একলা এতো বড়ো বাড়িতে থাকবেন কী করে' ?

—একলা থাকতেই তো এসেছিলাম, কিন্তু সারা দিন ধরে' আপনারা এমনি ভিড় করে' থাকলে কী করে' আর একা থাকি বলুন।

—এখন কী, টের পাবেন রাত্তির বেলা।

গোরাবাজারের এক ছোক্‌রা উকিল শাসিয়ে উঠ্‌লো : সান্যালরাও খুব সাহস দেখিয়েছিলেন, পরে দু'দিন যেতে-না-যেতেই পালাবার পথ পান্‌ না।

হিমাদ্রি হেসে বল্‌লে,—রাত্তির বেলায়ও একা থাক্‌বো বলে' মনে হচ্ছে না। সেই মেয়েটিই তো আসবে। আপনারা এতো সব তাকে ভয় দেখাচ্ছেন যে বেচারি এখন এলে হয়।

অনাহূত শুভানুধ্যায়ীদের বিদায় করে' হিমাদ্রি গৃহসংস্কারে

মন দিলে। অশরীরী মেয়েটির জন্যে সে এতো ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে সংস্কার শেষ করে' গৃহপ্রবেশ করতে তার তর সইছিলো না। একখানা ঘর অনায়াসে সে এখনই ব্যবহার করতে পারে, বাকিগুলি আস্তে-আস্তে সারিয়ে নিলেই চলবে। সম্প্রতি একটা চাকর ও মালি রাখা গেলো—ভূতের থেকে পেটের ভাবনাই তাদের বেশি।

শীত পড়ে' এসেছে—গঙ্গা এখন শুক্নো, ম্রিয়মাণ। পাতার মর্ম্মর ছাড়া ধারে-পারে কোথাও এতোটুকু শব্দ নেই—চারিদিকের শূন্যতা বিরহী চিত্তের মতো সঙ্গীহীনতার অনুভূতিতে নিস্পন্দ হ'য়ে আছে। বাড়ির সামনে দিয়ে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পায়ে-চলা সঙ্কীর্ণ একটুখানি পথ—এক পাল ছাগল খেদিয়ে একটা রাখাল-ছেলে এগিয়ে যায়, তা হ'লেই হিমাদ্রি যা-হোক্ একটা লোকের মুখ দেখতে পেলো। তা ছাড়া চোখ ফেলবার তার জায়গা নেই—বাইরে শীর্ণ নদীর ওপারে স্থির সবুজ গ্রাম আর কুণ্ঠিত আকাশের বিবর্ণ একঘেয়েমি।

ভেতরে তাকাবার কিছু নেই। নোনা-পড়া নোংরা দেয়াল—জায়গায়-জায়গায় ইটের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে—আগাগোড়া যেন একটা প্রতীক্ষার রিক্ততা আছে। হিমাদ্রির বিশেষ কিছু আসবাব নেই, একটি নিচু খাট, লেখবার ছোট একটি টেবিল, খান তিনেক চেয়ার, দুটো অতিকায় স্যুটকেস্—নদীর সমুখের ঘরখানা কোনোরকমে সে গুছিয়ে নিয়েছে। বাকি তিনখানি ঘর জীর্ণ, ধুলো-বালি আগাছা আর পাখীর বাসায় অপরিচ্ছন্ন।

ও-গুলিতে পরে নজর দিলেও চলবে, আপাততো রান্নার সাজ-সরঞ্জাম চাই। হাঁড়ি-কুঁড়ি, চায়ের বাসন, শিল-নোড়া, চাকা-বেলুন—চাকরটি যা-হোক্ খলিফা। এক কথায় মাথায় করে' প্রকাণ্ড বাজার এনে হাজির।

বিকেল বেলা সামনের ছোট বারান্দাটুকুতে বসে' হিমাদ্রি চা খাচ্ছে—পট্ থেকে আর এক কাপ ঢেলে শেষ করবার আগেই বেলা পড়ে' আসবে। তার পরেই আস্তে-আস্তে অন্ধকার—রাত্রি আর অন্তরের নির্জ্জনতাকে যখন আর আলাদা করে' দেখা যাবে না। কখন না-জানি সে আসবে! তাকে ঠিক দেখা যাবে তো? কী মূর্ত্তিতে তাকে দেখা যাবে? এই মর্ত্ত্যলোকের প্রতি কী তার আকর্ষণ যার মায়ায় আজো সে মাটিকে ভুলতে পারলো না? কী সে চায়, কী তার অভিযোগ!

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে দরজা জানলা খুলে রেখে হিমাদ্রি সেই নিশাচারিণীর প্রতীক্ষা করতে লাগলো। জোরে ঝাপটা দিয়ে উত্তুরে হাওয়া বইছে, পুরানো দেয়াল থেকে বালির চাপ খসে'-খসে' পড়ছে—তারই পায়ের শব্দ বুঝি! কিন্তু সে কি শব্দ করে' আসবে নাকি? হাওয়া আবার হঠাৎ নিঃশব্দ হ'য়ে আসতেই হিমাদ্রি চম্‌কে উঠলো। এইবার নিশ্চয় সে আসবে। হিমাদ্রি আলো নিভিয়ে দিলো, কিন্তু অন্ধকারে তাকে দেখা যাবে তো?

খালি আলো নেভালেই চল্‌বে না, তার বিশ্রামের ভঙ্গিটাও

শ্লথ করে' আনতে হ'বে। প্রতীক্ষায় রূঢ় চক্ষু মেলে চেয়ে থাকলে নিশ্চয়ই সে আসবে না—অপরিচিত পুরুষের পিপাসিত দৃষ্টিকে সে তা হ'লে ভয় করে বোধ হয়! হিমাদ্রি বিছানায় শুয়ে পড়ে' চোখ বুজ্‌লো। এইবার সে আসুক।

প্রখর প্রতীক্ষায় হিমাদ্রি ক্লান্ত হ'তে লাগলো। অসংখ্য পাতার মর্ম্মর ছাড়া একটি শব্দও আর শোনা যায় না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জিত নিদ্রার মতো গাঢ়। আবহাওয়াটা অতিমাত্রায় কঠিন—হিমাদ্রি ধড়মড় করে' উঠে বস্‌লো: আলো জ্বালালো—আগে যা, পরেও তাই—কেউ কোথাও নেই।

দিনের পর দিন এমনি নিরানন্দ প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্ত গুনে'-গুনে' হিমাদ্রির শরীর-মন জীর্ণ হ'তে সুরু করেছে। জায়গাটার স্বাস্থ্য ভালো নয় বললে চলবে না, তার মনেই নেই স্বস্তি। গঙ্গার পারে হঠাৎ সেই এক হিতৈষীর সঙ্গে দেখা—অল্প হেসে শুধালেন: কী, কেমন উৎপাত বুঝ্‌ছেন?

হিমাদ্রি বল্‌লে,—উৎপাত করলেন তো আপনারা। কী বল্‌লেন যে রোজ রাত্রে গঙ্গা থেকে মেয়েটি উঠে আসে,—কোথায় সে! কতো আশা করে' চেয়ে আছি, তার দেখা নেই।

—কিন্তু আপনার চেহারা তো দিব্যি খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে দেখছি।

—আপনারা তো কতো কিছুই দেখলেন!

—সবুর করুন,—ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন: এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আরো দু'দিন যাক্ না, টের

পাবেন আস্তে-আস্তে। এখন তাকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন, ক'দিন বাদে নিজেকেই আর ভালো করে' দেখতে পাবেন না।

হিমাদ্রি বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে,—তার মানে কী?

—মানে আর কিছুই নয়, দেখতে-দেখতে দেহখানা আদ্ধেক হ'য়ে যাবে শুকিয়ে। ডাইনির এমনিই বিষ-নজর।

হিমাদ্রি হেসে বললে,—তবে ডাইনি আপনাদের এই ম্যালেরিয়া! তার দেখা না পাবার জন্যে যথাসাধ্য সাবধানে আছি। শরীর বিশেষ খারাপ বুঝলে বাড়ি ছেড়ে দিলেই চলবে।

মাথা হেলিয়ে ভদ্রলোক বললেন,—তাই বলুন। বাড়ি ছাড়বেন বৈ কি। নইলে কি-আর রক্ষে আছে? ও তেমন নয়, বাড়ি থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে তবে ছাড়বে। দু'দিন আগে আর পরে।

তাই। শরীরটা হিমাদ্রির দিনে-দিনে কেমন মিইয়ে আসছে। এমনি একা-একা থাকতো, কোথাও কিছু ছন্দপতন হ'ত না। কিন্তু কেউ আসবে বলে' সারা দিন-রাত্রি অনর্থক প্রতীক্ষা করবার পর তার অনুপস্থিতির আঘাত স্নায়ুগুলিকে নিস্তেজ করে' ফেলে—তীব্র মাদকতার পর বিস্বাদ অবসাদের মতো। কেনই বা সে আসবে—সে কে! কোনো উত্তর নেই, অথচ এই নিঃশব্দতায় হিমাদ্রি শান্তি পায় না।

বাইরের বারন্দায় চেয়ারে গা ছড়িয়ে বসে' হিমাদ্রি বই পড়ছে। অন্ধকারে নদীর জল ভালো করে' চেনা যায় না, মনে হয় খানিকটা কালো শূন্যতা। চাকর জেনে গেলো, হিমাদ্রির

এ-বেলা আর খিদে নেই, দু'চার টুক্‌রো ফল পেলেই তার চলে। রাত আরো ঘন হ'তে লাগলো, ওপারের গ্রামের বাতিগুলি একেক করে' নিভ্‌ছে। এমন মরা নদী যে সামান্ত একটা নৌকা চলে না, বাঁধের ওপর একটা কোথাও লোক নেই। হিমাদ্রি বই বন্ধ করে' সেই নিঃশব্দতা শুনতে লাগলো।

কিন্তু কতোক্ষণ আর জাগা যায়! ঘরের আলোটা মিটমিট করছে, এক ফুঁয়ে সেটা নিবিয়ে পরিষ্কার, গরম বিছানায় নরম তুলোর লেপটা গায়ে টেনে ঘুমিয়ে পড়বে এবার। অন্তমনস্ক হ'য়ে হিমাদ্রি শোবার ঘরের দরজাটায় ঠেলা দিলো, হাওয়ায় কখন বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু দরজা খুলেই সে চম্‌কে উঠ্‌লো।

তার বিছানায় কে-একটি মেয়ে শুয়ে আছে! তার এতো দিনকার বিবর্ণ স্বপ্ন! তার প্রথম প্রেমের অপরিপূর্ণ পিপাসা!

হিমাদ্রি দু'ধাপ এগিয়ে এলো। মেয়েটি নিমীলিত চোখে কাৎ হ'য়ে শুয়ে আছে, এমন আলগোছে শুয়ে আছে যে বিছানাটা কোথাও এতোটুকু কোঁচ্‌কায় নি—পিঠ বেয়ে রুক্ষ বেণীটা একপাশে এলিয়ে আছে; একখানা হাত গালের তলায়, আরেকখানা বুকের কাছে প্রস্ফুটিত ফুলের একটি পাপড়ির মতো অকুণ্ঠিত। পরনে সাদা নরম একটি সাড়ি—হিমাদ্রির দুই চোখের অনিদ্রার মতো সাদা—এতো পাতলা যে দেহের প্রতিটি রেখার ঢেউ স্পষ্ট উছ্‌লে উঠছে। দেহে তার যৌবনের পরিপূর্ণতা, মরণের এক বিন্দু কালিমা নেই।

হিমাদ্রি আরো এক ধাপ এগোলো। মেয়েটি তেমনি

স্থির,—দু'জনের ব্যবধান সঙ্কীর্ণতর হ'য়ে এলো, তবু সে ঘনতর সান্নিধ্যের তাপ অনুভব করে' একটুও চঞ্চল হ'য়ে উঠলো না। হিমাদ্রি স্তব্ধ হ'য়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সে-রেখার ওঠা-নামা দেখতে লাগলো। মনে হ'লো এতো কোমল, ভঙ্গুর সে-রেখা, হাত দিয়ে ছুঁতে গেলেই তা মুছে যাবে। লজ্জার অতীত, লোভের অতীত, এমন-কি বিশ্বাসেরও অতীত এই ছায়া!

হিমাদ্রি ভয়ে-ভয়ে ডাকলে: কে?

মেয়েটি উত্তর দিলো না, চুপ করে' পড়ে' রইলো। নিটোল কনুইটি গোল হ'য়ে দুম্‌ড়ে আছে, আঙুলগুলি যেন অনুচ্চারিত সুর, পুরন্ত দুটি ঠোঁটে গভীর স্তব্ধতা। স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম দু'টি ভুরুর তলায় নিমীলিত চোখের নিচে জীবনের রহস্য। জাগরণের রহস্য। ভয়ে-ভয়ে হিমাদ্রি মেয়েটির আরো কাছে এগিয়ে এলো। কিন্তু মেয়েটি তেমনি ছবির মতো নিষ্প্রাণ। নিদারুণ আগ্রহে হিমাদ্রির স্নায়ুগুলি সাপের ফণার মতো অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলো, মেয়েটির গায়ে ঠেলা দিয়ে সে ডাকলে: তুমি কে?

কোথায় কে—শূন্য বিছানা, কোথাও এতোটুকু কোঁচ্‌কায় নি। বন্ধ ঘর যেন কা'র চলে' যাওয়ার রিক্ততায় হঠাৎ হাহাকার করে' উঠলো। জোরে হাওয়া দিয়েছে, গাছের পাতায় সর্‌-সর্‌ শব্দ—কা'র বিদায় নেওয়ার কান্না। হিমাদ্রি বাইরে চলে' এলো। কেউ কোথাও নেই—আকাশে মেঘ করেছে বলে' নদীর শীর্ণ দেহে ঈষৎ রোমাঞ্চ জেগেছে। তারপর বাকি রাত আর সে এলো না।

পরের রাত্রে হিমাদ্রি ঢের আগে এসেই বিছানা নিলো। তার জন্যে এক পাশে জায়গা করে' রাখলে—মাঝ রাতে সে যদি ঘুমোতে আসে! ঠিক, আবার সে এসেছে। হিমাদ্রির কখন একটু তন্দ্রা এসেছিলো বুঝি, ঘরের আবহাওয়াটা কা'র সমীপবর্ত্তিতায় হঠাৎ তপ্ত হ'য়ে উঠ্‌তেই চোখ চেয়ে সে দেখতে পেলো সে এসেছে। আশ্চর্য্য, তার পাশে বিছানায় এসে শোয় নি, দেয়ালের আলোয় চেয়ারে বসে' একখানি বই পড়ছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, তবু তার আজ ঘুমোবার নাম নেই। হিমাদ্রি বালিশের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে শরীরটাকে বিছানার এক প্রান্তে এগিয়ে আন্‌লে; বল্‌লে,—বলো না, তুমি কে?

মেয়েটি নিরুত্তর, বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে চোখ তুল্‌লো না। আজ তাকে হিমাদ্রি নতুন ভঙ্গিতে দেখলো, কিন্তু কী তার অপূর্ব্ব শ্রী! যেমন কঠিন পবিত্রতা, তেমনি দুঃস্পৃশ্য সৌন্দর্য্য। কে সে—সেই আত্মঘাতিনী মেয়ে, না, আর কেউ! না, তার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন! হিমাদ্রি আবার বল্‌লে,—কোথায় তুমি থাক? কেন এমন রাত করে' তুমি এলে?

মেয়েটির তবুও কোনো সাড়া নেই। ও যদি সেই আত্মঘাতিনী মেয়েই হ'বে, বা তার ব্যর্থ কামনার প্রতিমা, তবে সে প্রতিবাদ না করে' এমনি নীরব ভঙ্গির সঙ্কেতে তাকে সস্নেহে সম্বোধন করে কেন? তাকে দেখে তার ভয় না হ'য়ে আশা হয় কেন? কেন মনে হয় এই মূর্ত্তি মৃত্যুতে মলিন হ'বার নয়, কামনায় একে কাতর, আবিল করা যায় না, এ এতো পরিপূর্ণ

যে পরিবর্ত্তনের এতে এতোটুকু চিহ্ন পড়বে না? আজো বাইরে তার আগাগোড়া শুভ্রতা—ভেতরে সেই পূর্ণোচ্ছ্বসিত নগ্নতার আগুন! তার নৈকট্যে আনন্দ নয়, দীপ্তি; সে-দীপ্তিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তিমিত হ'য়ে আসে।

কিন্তু এতো কাছেই যখন এলো, তখন সে কথা কয় না কেন? অন্তত কেন সে রাত ক'রে এখানে আসে, তাও তো জানা দরকার। বাইরে এখনো সমানে বৃষ্টি হচ্ছে—সহজে আর সে পালাতে পারছে না। হিমাদ্রি জোর-গলায় বল্‌লে,—কথা কও।

মেয়েটি কথা কইতে আসে নি—সে এসেছে শুধু তার নির্জ্জনতায় প্রাণসঞ্চার করতে। তেমনি চোখ নামিয়ে সে বসে' রইলো, বইয়ের পৃষ্ঠাটি পর্য্যন্ত উল্‌টোলো না। এই স্তব্ধতা হিমাদ্রির অসহ্য, বিছানায় আরো এগিয়ে সে মেয়েটির হাত চেপে ধর্‌লো; বল্‌লে,—আমার কাছে তুমি কী চাও?

অমনি কেউ কোথাও নেই, খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে মাত্র। হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে ক্ষিপ্র হাতে আলো জ্বালালো। বৃথা; সে আবার চলে' গেছে। আশ্চর্য্য, খাটের সামনে চেয়ার আছে বটে, কিন্তু বইটা কোথাও পড়ে' নেই। আর, বই এখানে কী করে'ই বা আসবে? তাক ভরে' বই তার পরিপাটি করে' সাজানো। হাতের বইটা সে বিছানার একপাশে নিয়ে শুয়েছিলো—সেটাও নিশ্চয় খোয়া যায়নি।

হিমাদ্রি জোরে নিশ্বাস নিলো! ভিজা হাওয়ায় তার চলে' যাওয়ার গন্ধ লেগে আছে। এই এতো ঝড়-জলের মধ্যে

কোথায় সে অন্তর্ধান করলে? হিমাদ্রি বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলো, বৃষ্টির ঝাপটায় বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়ানো গেলো না। বৃষ্টি থামবার জন্যে কেউ কোথায় বারন্দায় অপেক্ষা করে' নেই—নদী নতুন খুসিতে ছল্‌ছল্‌ করছে।

তারপর রোজ রাতেই সে আসে—এবং হিমাদ্রির এই ঘরটিতে, সে শুয়ে না থাকলে তার একাকী বিছানায়। একটিও সে কথা কয় না, খালি তার লঘু উপস্থিতি দিয়ে এই মৃত নির্জ্জনতায় প্রাণ সঞ্চার করে। হিমাদ্রি তার রহস্য এবার বুঝেছে। তাই ব্যস্ত হ'য়ে সে তাকে কোন প্রশ্ন করে না, সে জানে সে তার জীবনের অন্তরঙ্গতম মুহূর্ত্তের অবিনশ্বর প্রতীক; তাকে স্পর্শ করতে আর সে হাত বাড়ায় না, জানে স্পর্শ করতে গেলেই তার ক্ষয়। হিমাদ্রি তাই তাকে নিবিষ্ট চোখে দেখে—অশরীরী রেখার ঢেউ, ভাবময় ছায়া! দিনের আলোর রুক্ষতায় জীবিকা-নির্ব্বাহের আয়োজন-ব্যস্ততার মাঝে আর তাকে দেখা যায় না।

জীবনে এই তার নতুনতর নেশা, প্রথমতম প্রেম।

*

*　　　　*

এই সহরে অল্প দিনের মধ্যেই মাত্র এক জনের সঙ্গে তার

হৃদ্যতা হয়েছে, নাম অমূল্যরত্ন—খাগ্‌ড়ার দিকে বাসা—যার সঙ্গে বসে' দু'ঘণ্টা আলাপ করে' সে সুখ পায়। অমূল্যরত্ন সেট্‌লমেণ্টের হাকিমি করে—এখনো বিয়ে করে নি। রবিবারের সকালবেলা হিমাদ্রি এসে হাজির। অমূল্যর বাড়িতে তার চায়ের নেমন্তন্ন। অমূল্যরত্ন বল্‌লে,—কি, প্রেতিনীর দেখা পেলেন এতো দিনে ?

হিমাদ্রি গম্ভীর হ'য়ে বললে,—পেলাম। এতো প্রতীক্ষার ফল না-মিলে কি পারে ?

—পেলেন ? কেমন চেহারা ?

—অত্যন্ত সুন্দর। এতো রূপ আমি দেখি নি।

—বলেন কি ? অমূল্যরত্ন টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লো : কী বলে ?

—কিছুই বলে না। আপনাকে বলতে বাধা নেই, এই তার কিছু-না-বলাটিই ভারি সুন্দর।

—খাসা ! এ যে উপন্যাস শোনাচ্ছেন মশাই। অমূল্যরত্ন সোৎসাহে টেবিল চাপড়ালো : তার পর ?

—তার পর সে-বাড়ি আমি ছাড়ছি না। যে যাই বলুক।

—রোজ তাকে দেখেন ?

—রোজ।

—আমি গেলে আমিও দেখতে পাবো ?

এ-কথার উত্তর দেবার আগে চায়ের বাটি ও মিষ্টির থালা হাতে করে' ঘরে একটি মেয়ে ঢুকলো ! তার উপস্থিতিতে ছোট

ঘর যেন সহসা তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। পরিপূর্ণ চোখ মেলে হিমাদ্রি তার দিকে চেয়ে রইলো। উত্তেজনায় সে যেন এখুনি ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে।

এ যে সেই—যে রোজ রাত ক'রে তার ঘরে আসে—নিঃশব্দ আকাশ থেকে নেমে, না নিরালা নদীর জল থেকে উঠে! সর্ব্বাঙ্গে সেই রেখার ঢেউ, সেই ভঙ্গির সুষমা! একেবারে অবিকল। পরনের সাড়িটি পর্য্যন্ত গরদ—গলিত জ্যোৎস্নার মতো শুভ্র, তার অন্তরালে সেই উদ্বেল নগ্নতা! বেণীটি শুক্‌নো, আঙুলগুলি করুণ, চোখের দৃষ্টিটি স্তব্ধ, নির্লিপ্ত। সেই রেখা হঠাৎ রূপ নিয়ে উঠবে, এই উত্তেজনা সহ্য করবার মতো হিমাদ্রির স্নায়ু নেই।

টেবিলের উপর চায়ের বাটি আর মিষ্টির থালা রেখে মেয়েটি চলে' গেলো। হিমাদ্রি তাকে নতুন করে' ফের দিনের বেলায় দেখছে না তো? না, এ তার অবিকল প্রতিলিপি, তার চলে' যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের শূন্যতা বিরহের সুবাসে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছে।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো হিমাদ্রি জিজ্ঞাসা করলে: এ কে?

অমূল্যরত্ন বললে,—আমার ভাই-ঝি। স্কটিশে বি-এ পড়ছে। দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে এখানে।

—কী নাম?

—কেন, কেমন দেখলেন?

প্রশ্নের তাৎপর্য্য ঠিক অনুধাবন করবার চেষ্টা না করে'

অস্থির হ'য়ে হিমাদ্রি বললে,—বলুন, কী নাম! আমার ভীষণ দরকার।

অমূল্যরত্ন ধীরে উচ্চারণ করলো: উর্ম্মিলা।

—উর্ম্মিলা? হিমাদ্রির সমস্ত স্নায়ু যেন একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো। বললে,—আপনি কিছু মনে করবেন না, তাকে আরেকবারটি কোনো ছুতোয় এখেনে ডাকতে পারেন?

তার আকস্মিক উৎসাহের কারণ ঠিক না বুঝতে পারলেও অমূল্যরত্ন মনে-মনে খুব খুসি হ'লো। ঠোঁটে হাসি চেপে সে বললে,—কিন্তু আগে বলুন তাকে আপনার পছন্দ হয়েছে।

তাকে হঠাৎ চায়ের নেমন্তন্ন করার রহস্য এতোক্ষণে হিমাদ্রি কিছুটা অন্তত বুঝতে পেরেছে। হ্যাঁ, তাকে পছন্দ হয়েছে বৈ কি। কিন্তু দাদা যে বলেছিলেন তাকে দেখামাত্রই ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে সম্মতি দিয়ে আসতে হ'বে—সেই কারণে নয়, একান্ত ও তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষার পর যে-ছায়া সে দেখতে পেতো, এ যে তারই স্থূল, বাস্তব প্রতিমূর্ত্তি! এও কী করে' সম্ভব হয়? সেই ছায়া যেন উর্ম্মিলারই একটি অস্পষ্ট সঙ্কেত, অথবা সেই সঙ্কেতই উর্ম্মিলার মাঝে অতি-ব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে।

হিমাদ্রি খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে কপালের ঘাম মুছে বললে,—আমাকে উনি আর সঠিক চেনেন না তো? এমনি একটু আলাপ করিয়ে দিতে আপত্তি আছে?

—আপত্তি কী! আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে'ই তো আপনাকে নেমন্তন্ন করে' এনেছি, আর ওকে এনেছি

কলকাতা থেকে। অমূল্যরত্ন ভেতরে যেতে-যেতে হেসে বললে,—এমন গুণীর সঙ্গে আলাপ করতে কে না চায় বলুন।

গুণী অর্থ হিমাদ্রির অল্প বয়স ও দেদার পয়সা,—তা সে জানে।

উর্ম্মিলা এসে দাঁড়ালো ও খানিকক্ষণ টেবিলের উপর এটা-ওটা একটু নেড়ে-চেড়ে একটা চেয়ারে বসে' পড়লো—হাতে একখানা বই থেকে তার উপস্থিতিতে একটি সম্পূর্ণতা দিয়েছে। মূঢ়ের মতো হিমাদ্রি তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। সন্দেহের কিছুই আর নেই—এই সেই নিশাচারিণী ছায়া, বা সেই ছায়াই তার আত্মার প্রতিচ্ছবি। যখন রোজ রাতেই সে তার ঘরে গিয়ে অতিথি হয়, তখন আর সন্দেহ নেই, এই তার সহজীবনযাত্রিনী, এই তার পরমনির্ব্বাচিতা।

উর্ম্মিলার উপস্থিতিতে এখন রমণীয় একটি শোভনতা এসেছে—কিন্তু কী যে তাকে জিগ্‌গেস করা যায় হিমাদ্রি কিছুই ভেবে পেলো না। এক জিগ্‌গেস করা যেতে পারে: 'আগে তোমাকে কোথায় দেখেছি বল্‌তে পারো?' কিন্তু সে-প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর হ'বে। সে রোজ তাকে দেখতে পায়, যখন দিনের নির্ম্মম রুক্ষতার পর রাত্রি অন্ধকারে ও অন্তরঙ্গতায় নিবিড় হ'তে থাকে, যখন চারিদিকে স্তব্ধতার ও স্পর্শহীনতার ঢেউ! এখনো কিছু মুখ ফুটে তার বলা হলো না। চোখ তুলে হঠাৎ আবার হিমাদ্রি দেখতে পেলো—শূন্য বাটি ও থালা নিয়ে উর্ম্মিলা কখন ঘর থেকে চলে' গেছে। তেমনি অতর্কিত তিরোধান। এবং তার যাওয়ার পর তেমনি ঘরময় স্তূপীকৃত শূন্যতা!

অমূল্যরত্ন তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করলে: আমার ভাইঝিটিকে তখন দেখতে আপনার কী আপত্তি হয়েছিলো? বলুন, পছন্দ হয়েছে তো? মেয়েরা পরদার আড়ালে উঁকি-ঝুঁকি মারছেন।

হিমাদ্রির আর দ্বিধা করবার সময় আছে নাকি? আম্‌তা-আম্‌তা করে' বললে,—সে-সব আমি কী জানি? দাদাই হচ্ছেন সব—তাঁকে লিখবেন না-হয়।

পরদার আড়ালে হাসি চাপবার একটা মিলিত চেষ্টার আভাস পাওয়া গেলো।

তবু তাদেরকে এ-কথা বুঝিয়ে দেওয়া হ'লো না যে উর্ম্মিলার রূপ দেখেই সে গলে' যায়নি—সে বুঝেছে যে উর্ম্মিলা তার প্রথম প্রেমের মূর্ত্তিময়ী উপমিতা, তার কল্পনাছায়ায় সাকারা অভিব্যক্তি। জীবনদেবতা তাকে নির্ভুল ইঙ্গিত পাঠিয়েছে—তাতে তার আর সন্দেহ নেই। কিন্তু গূঢ় ব্যাখ্যা তলিয়ে কে বুঝতে চাইবে? স্থূল প্রকাশটাই সকলে দেখে, বুদ্ধি দ্বারা অর্থও অতি সহজে আয়ত্ত করে' ফেলে—কিন্তু কা'র এমন কল্পনা আছে যে সেই মূর্ত্তির অন্তরালে ছায়া আবিষ্কার করবে?

যাই হোক্‌, ছায়ার চেয়ে মূর্ত্তির যেমন বেশি উজ্জ্বলতা, তেমনি তার বেশি প্রয়োজন। এতোদিনে হিমাদ্রির বুদ্ধি খেল্‌লো। এবং একদিন এই ঘরেই উর্ম্মিলাকে নিয়ে সে স্পর্শে, স্বাদে, ঘ্রাণে, ভুঞ্জনে শিহরিত হ'বে ভাবতে হিমাদ্রির মুহূর্ত্তগুলি অবশ হ'য়ে এলো।

হিমাদ্রি রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো। আজকের ছায়া না-জানি কতো অপরূপ হ'য়ে দেখা দেবে! প্রতীক্ষায় হিমাদ্রি অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু সেই ছায়া আজ আর এলো না। সে হিমাদ্রির কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

এ কেমনধারা হ'লো? হিমাদ্রি অস্থির হ'য়ে বারান্দায় পাইচারি করছে। অদূরে নদীর জল ম্রিয়মাণ হ'য়ে আছে, তারাগুলি আকাশময় ছড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু আজ তাদের অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই। হিমাদ্রি আবার এসে শুলো। দু'চোখ বুজে অন্ধকারের কাছে সে সকাতরে প্রার্থনা করতে লাগ্‌লো—চোখ খুলেই তার চকিত দৃষ্টির বিস্ময় যেন সেই ছায়ার রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু বৃথা, চোখ খুলেও সেই অন্ধকার।

আশ্চর্য্য, সেই ছায়া আর নেই। তার পরের দিনও সে এলো না। তার পরের দিনও না। তীব্র প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় হিমাদ্রি ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। খেতে রুচি নেই, বেড়াতে বেরুলে কারো সঙ্গে অকারণে দেখা হ'য়ে যাবে এবং তার এই নির্জ্জনতার সুর থাকবে না, তাই সে বারান্দাতেই চেয়ার টেনে চুপ করে' বসে' থাকে, ঘুমুতে যেতেও ইচ্ছে করে না, ঘুমোবার আগের আবেশময় গাঢ় মুহূর্ত্তগুলিতে সেই ছায়া আর পড়ে না ব'লে।

কিন্তু কেন যে সেই ছায়া হঠাৎ বিদায় নিলো হিমাদ্রি তার কূল-কিনারা করতে পারে না। অথচ মূর্ত্তির লোভে

অনায়াসে সে উর্ম্মিলার দ্বারস্থ হ'তে পারে—অমূল্যরত্ন বিয়ের তারিখ ঠিক করে' পাঠিয়েছে, দু'চারদিন বাদে মা আর বৌদিদি এখানে আসছেন।

সেই ছায়া যেন হঠাৎ আত্মঘাতিনী হ'লো। এই নির্জ্জনতার নিঃশেষে ধ্যানভঙ্গ হ'তে বসেছে। ছায়া হ'তে চলেছে মূর্ত্তিমতী, রেখার ঢেউ হ'তে চলেছে মাংসস্তূপ! সুন্দর উজ্জ্বল নগ্নতার ওপর কঠিন আবরণ এসে পড়লো। সে-মূর্ত্তিতে লজ্জা আর লোভ, জ্বর আর জরা—স্থূলতাময় কুৎসিত তার উপস্থিতি—হিমাদ্রির স্বপ্ন গেলো ভেঙে। এই মোহমুক্তি সে সইতে পারলো না।

তার মনে হ'লো ঐ ছায়া হচ্ছে তার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন—উর্ম্মিলার শরীর-সঙ্কেতে যার অস্পষ্ট আভাস সে পেয়েছিলো—ভেবেছিলো ছায়ার সেই প্রতিলিপিকে অধিকার করতে পারলেই তার যৌবন ধন্য হ'য়ে যাবে। এখন তার মনে হ'লো ঐ ছায়া হচ্ছে তার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন—মোহে যার জন্ম, মূর্ত্তিতে যার অবসান। উর্ম্মিলার পায়ের শব্দ শুনে ছায়া মুখ লুকোলো। তাকে আর উদ্ধার করা গেলো না। মূর্ত্তিই পড়ে' আছে, ছায়া নেই।

হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি কল্‌কাতাতে টেলি করে' দিলো, মা আর বৌদিদি যেন এখন বহরমপুরে না আসেন, কেন-না খুব জরুরি কাজে হিমাদ্রি আজ বম্বে যাচ্ছে। সময় থাকলে বাড়িতে নেমে সে দেখা করে' আসবে।

দেখা করবার সময় হ'লো না। হিমাদ্রি ট্রেনে চেপে বসলো—বহুদূরের ট্রেন; কোথায় যে সে নাম্‌বে তার এখনো ঠিক নেই। ছায়া তাকে যতো দূর টেনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। যতো দিনে না সাবয়ব কামনার জন্যে তার দেহ উদ্বিগ্ন হ'রে ওঠে!

বিবাহিতা

কলিকাতায় রাখালকে যে ঠিক তাহার বিমলা-দিদিদের পাশের বাড়িতেই আসিয়া উঠিতে হইবে তাহা ঘুণাক্ষরেও সে ভাবিতে পারে নাই। আসিবার আগে বিমলা-দিদির মা আকুলি-বিকুলি করিয়া তাহাকে অনেকবার বলিয়া দিয়াছিলেন, সে যেন সময় পাইলেই বিমলার খবর লয়—পুরানো বাসা ছাড়িয়া কোথায় তাহারা এখন উঠিয়া গিয়াছে, কেমন তাহারা আছে, বিমলার কিছু-একটা এখনো হইল কি না—খবর পাইয়াই যেন তাঁহাকে সে তক্ষুনি একটা চিঠি লেখে। চক্ষে না দেখুন, বিমলা বাঁচিয়া আছে, সুখে আছে—এ খবরটুকু পাইলেও তিনি খানিকটা সুস্থ হ'ন।

গাঁয়ের ছেলে ম্যাট্রিকুলেসান্ পাস্ করিয়া নতুন সহরে আসিয়াছে। এই বৃহৎ জনারণ্যে কোথায় সে তাহার বিমলা-দিদির খোঁজ করিবে! কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে পাশের বাড়িতেই সে বিমলা-দিদিকে দেখিতে পাইবে এটাও একটা অলৌকিক ব্যাপার।

পাশাপাশি দুই বাড়ির মাঝখানে একটা ভাঙা দেয়াল, কিন্তু তাহা দোতলা পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই—সেইখানে দুই বাড়ির দুইটি জানালা একেবারে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া আসিয়াছে। এই পারের ঘরে বসিয়া রাখাল ও-পারে তাহার বিমলা-দিদিকে দেখিতে পাইল।

—কে, বিমলা-দিদি না?

ও-পারের নারীমূর্ত্তি চমকাইয়া উঠিয়া এই দিকে চোখ ফিরাইল।

মুখে খানিকক্ষণ কোনো কথা আসিল না। ধীরে-ধীরে জান্‌লার কাছে সরিয়া আসিয়া বিমলা কহিল,—কে, রাখাল? কবে এলে এখানে?

রাখাল উৎফুল্ল হইয়া বলিল,—কাল রাত্রে। তুমি যে এতো কাছে আছ তা আমি ভাবতেই পারিনি। কিন্তু তুমি কী হ'য়ে গেছ, বিমলা-দি?

বিমলা নিজের সর্ব্বাঙ্গে একবার চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া ম্লান হাসিয়া কহিল,—চেহারা খুব খারাপ হ'য়ে গেছে, না?

—ভীষণ। তোমাকে যে গোড়ায় আমি চিনতেই পারিনি। কিছু অসুখ করেছে নাকি? আছ কেমন?

তেমনি মলিন হাসিয়া বিমলা বলিল,—মন্দ কী! তুমি তো দেখছি দিব্যি নধর হ'য়ে উঠেছ। সেই দুধের রাখাল এখন কতো বড়ো হ'য়ে উঠেছ। মাথায় টেরি, লম্বা কোঁচা—আমিই বা প্রথমে কই চিনতে পারলাম! ডাক শুনে ভাবলাম কে জানি কে হ'বে। বয়েসে গলার স্বর অব্‌ধি কেমন দরাজ হ'য়ে উঠেছে।

রাখাল কুণ্ঠিত হইয়া কহিল,—আমাকে কবে তুমি আবার 'তুমি' বলতে?

হাত তুলিয়া দুইটা গরাদে ধরিয়া সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিমলা বলিল,—তুমি আর সেই ছোট্টটি আছ নাকি? দস্তুরমতো ভদ্দরলোক। ঠোঁটের ওপর দিব্যি আজকাল গোঁফের রেখা উঠেছে। চিবুকটা গলার কাছে নামাইয়া দৃষ্টি ঘন করিয়া বিমলা রাখালের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেই বিমলা-দিদি কী হইয়া গেছে! শুকাইয়া-শুকাইয়া শরীরটা দড়ি বনিয়া গেছে, মণিবন্ধের নিচে হাতের উল্‌টো পিঠে শিরগুলি মোটা হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে,—সেই বিমলা-দিদি আর নাই। পরনের সাড়িটা জায়গায়-জায়গায় ছেঁড়া, সেলাই করিয়া কোনোরকমে সেই শীর্ণতার লজ্জা লুকাইয়া রাখিয়াছে, দেখিয়া রাখালের মন বিমর্ষ হইয়া উঠিল।

বিমলা বলিল,—কলকাতায় তুমি কী মনে করে' ?

রাখাল বলিল,—আমি এবার যে ম্যাট্রিক পাস্ করলাম। কলেজে পড়তে এসেছি। কিন্তু আমাকে তুমি পর ভাবতে শিখলে কবে থেকে? বিয়ে করে' খুব যে ভদ্র হ'য়ে গেছ দেখছি।

চোখমুখে একটা কৃত্রিম আতঙ্কের ভঙ্গি করিয়া বিমলা বলিল,—ওরে বাবা, পাস্ করে' এসেছ, তোমার নাগাল আর পায় কে বলো। বিয়ের পর ভদ্র একটু হ'তে হয় বৈ কি, রাখাল! সে-সব দিন কি আর থাকে? পরে মুখ টিপিয়া হাসিয়া চোখ নামাইয়া কহিল, আর পর হ'লেই বুঝি লোকে 'তুমি' বলে' ডাকে? তা, এই বাড়িতেই থাকবে তো? না, আবার মেস্‌এ-টেস্‌এ উঠে যাবে! মধুসূদনবাবু তোমার কে!

—দূর সম্পর্কের মামা। এইখেনেই থাকবো।

—হ্যাঁ বাপু, বিমলা গম্ভীর হইয়া কহিল,—আত্মীয়-অভিভাবকের বাড়িতেই ওঠা ভালো। যে-জায়গা এ কল্‌কাতা, কখন কা'র মাথা বিগড়ে যায় ঠিক নেই। তা ছাড়া উঠ্‌তি-বয়েসে

গাঁ থেকে সবে এসেছ—জান্‌লা দুইটা দুই দিক হইতে গুটাইয়া আনিয়া কানের কাছে চাপিয়া ধরিয়া বিমলা তাহার মুখখানাকে প্রখররূপে স্পষ্ট করিয়া ধরিল।

আবার কহিল,—রান্না চাপিয়ে এসেছি. ভাই, আমি চল্‌লাম। শাশুড়ি ক্যাঁট্‌ ক্যাঁট্‌ সুরু করেছে। ভয় কী, একেবারে তোমার হাতের কাছেই তো আছি। বলিয়া সশব্দে একটু হাসিয়া বিমলা জান্‌লা বন্ধ করিয়া ছিট্‌কিনি টানিয়া দিল।

অনেকক্ষণ রাখালের নড়িবার-চড়িবার শক্তি রহিল না। এ তাহার সেই বিমলা-দিদি কি না, জান্‌লাটা বন্ধ হইয়া যাইবার পর এখন তাহার সন্দেহ হইতেছে।

সমস্ত দিনে সেই জানালা আর খুলিল না। রাত করিয়া হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই রাখাল স্পষ্ট শুনিতে পাইল পাশের সেই ঘরে কে কাঁদিতেছে। কণ্ঠটা স্ত্রীলোকের, এবং খানিকক্ষণ কান খাড়া করিয়া রাখিতেই মনে হইল এ-স্বর বিমলা-দিদির না হইয়াই যায় না। কান্নার আগেকার পরিচ্ছেদটাও তাহার সামনে উদ্‌ঘাটিত হইল। রাত করিয়া বাড়ি ফিরিয়া স্বামী তাহাকে মারপিট করিতেছে। এবং কী অবস্থায় এই ব্যাপারটা সম্ভব হইল, তাহা অনুমান করিতেও রাখালের দেরি হইল না।

তাহার সেই বিমলা-দিদির এই নিদারুণ পরাভবের পরিচয় পাইয়া রাখাল সারারাত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহাদের গ্রামে এই মেয়েটির কী দুর্দ্দান্ত প্রতাপ ছিল, গাছে চড়িতে, সাঁতার কাটিতে, মারামারি করিতে ছেলেদের মধ্যেও তাহার জুড়ি ছিল

না। একবার তাহাদের বাড়িতে সিঁধ কাটিয়া চোর ঢুকিলে সামান্য একটা হাত-দা লইয়া বিমলা তাহাকে তাড়া করিয়াছিল —সেই ছাড়াবাড়ির ডোবার ধার পর্য্যন্ত। কোমরে আঁচল জড়াইয়া, মাথায় চূড়খোঁপা বাঁধিয়া, হাতে একটা লণ্ঠন লইয়া একা সে বুড়িঝিয়ারির শ্মশানে গিয়া মড়ার হাড় লইয়া আসিয়াছে। সেই তাহার বিমলা-দিদি, পড়িয়া-পড়িয়া মার খায়, অথচ সামান্য একটা প্রতিবাদ করিতে পারে না! বিনাইয়া-বিনাইয়া নির্লজ্জের মত কাঁদে।

শুধু কি তাই? তাহাদের গাঁয়ের ইস্কুলে মেয়েদের মধ্যে মাত্র এই বিমলা-দিদিই উচ্চ প্রাইমারি পাস করিয়া বৃত্তি পাইয়াছিল। পাস্ করিবার পর তাহাকে আর পায় কে! ধুয়া ধরিয়া বসিল সহরে গিয়া সে আরো পড়িবে এবং জীবন থাকিতে সে বিবাহ করিবে না। এখন বিবাহ করিয়া তাহার জীবন থাকিলে হয়। নিজের চেষ্টায় দুয়েক বছর সে আরো পড়িয়াছিল এবং যখনই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ উত্থাপন করিয়া বরপক্ষ হইতে কেহ তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে, সে তাহার মুখের উপর এমন সব বিদ্ঘুটে উল্টা প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছে যে ভদ্রলোক পলাইবার পথ পায় নাই। একবার স্বয়ং বর তাহাকে পছন্দ করিতে আসিলে সে নাকি জিভ বাহির করিয়া তাহাকে ভেঙচাইয়া দিয়াছিল।

কেবল বাহিরের ব্যবহারেই তাহার কর্কশ কাঠিন্য ছিল না, অন্তরে ছিল দুর্নিবার তেজ, চিন্তায় ছিল অনন্যসুলভ স্বকীয়তা।

বড় হইয়া, বিদুষী হইয়া, দেশ ও দেশ ডিঙাইয়া সমস্ত পৃথিবীর কত যে সে কাজ করিবে তাহার তালিকা দিয়া সে শেষ করিতে পারিত না। রাখাল সব কথা তখন বুঝিতও না, মুগ্ধ হইয়া বিমলা-দিদির স্বপ্নরঞ্জিত ডাগর চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া থাকিত।

কিন্তু একদিন জোর করিয়াই বিমলার বিবাহ দেওয়া হইল। তাহার পৃথিবী-ভালো-করিবার তুচ্ছ সখের জন্য বাপ-মা জাতে পতিত হইতে পারেন না, তাহা ছাড়া মেয়েকে কোনক্রমে বিদায় দিতে পারিলেই কাঁধ চারিটা হাল্‌কা হইয়া যায়। লোকে অপবাদ দিত যে, বিবাহের নাম শুনিয়া বিমলা গলায় দড়ি দেওয়া থাক্‌, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে তো না-ই, বরং মুখচন্দ্রিকার সময় নিবিড়াভ চক্ষু তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে অনিমেষে চাহিয়া রহিয়াছিল; কিন্তু রাখালের কেবলই মনে হইত তাহার ঐ আপাতস্তব্ধতার পিছনে বিদ্রোহের প্রলয়ানল প্রচ্ছন্ন আছে।

এবং বিবাহের পর দীর্ঘ চার বৎসরের মধ্যে তাহার যে পাকাপাকি খবর পাওয়া যাইত না, রাখালের মনে হইত, এতদিনে তাহার বিমলা-দিদি সংসারে তাহার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে। বিবাহিত জীবনের পঙ্গুতা বিসর্জ্জন দিয়া তাহার আদর্শের আলোতে একাকিনী বিমলা-দিদির যাত্রা সুরু হইয়াছে। যাহাকে সে আপন প্রেরণায় লাভ করে নাই, তাহার সঙ্গে তাহার কিসের সম্পর্ক?

সেই বিমলা-দিদি কি না দিব্যি পিঠ পাতিয়া তাহার স্বামীর মার খাইতেছেন !

*

*　　　　*

পর দিন দুপুরের দিকে ও-পারের জান্‌লাটা খুলিয়া গেল। কলেজের পড়া এখনো আরম্ভ হয় নাই বলিয়া রাখাল বাড়িতেই আছে।

—কী করছ, রাখাল ?

রাখাল চমকিয়া চোখ চাহিল। বিমলা জান্‌লা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছে, পরনে তাঁতের খেলো একখানা রঙিন সাড়ি, পরিবার অর্দ্ধ-অসম্বৃত ভঙ্গিতে তাহার শারীরিক উপস্থিতিটা আরো বেশি উচ্চারিত হইয়া উঠিল। ঠোঁটে হাসি ঢালিয়া কহিল,—কলেজ ছুটি বুঝি আজ। একেলাটি চুপ করে' বসে' আছ ?

রাখাল তক্তপোষ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জান্‌লার কাছে আসিয়া কহিল,—হ্যাঁ, তোমাদের বাড়িতে যাবো ?

সহসা জিভ কাটিয়া বিমলা কহিল,—সর্ব্বনাশ ! পরপুরুষকে বাড়িতে ঢুকতে দেব কী ! এই যে তোমার সঙ্গে মুখ নেড়ে কথা কইছি, কেউ দেখে ফেল্‌লে আমাকে আর আস্ত রাখবে না।

নিতান্ত কুণ্ঠিত ও জড়সড় হইয়া রাখাল বলিল,—কী যে

তুমি বলো। আমি তোমার ছোট ভাইর মতো—সেই রাখাল। ইস্কুলে যাবার সময় নিজের হাতে কতোদিন গিঁট দিয়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছ, জুতোয় ফিতে বেঁধে দিয়েছ—মনে নেই তোমার? কে কী বলবে? এক চড়ে তার দাঁত বত্রিশটা গুঁড়ো করে' দেবো না?

বিমলা খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল,—এখন তো দেখছি নিজ হাতেই লম্বা কোঁচা ঝোলাতে শিখেছ।

রাখাল অস্থির হইয়া কহিল,—না, ঠাট্টা নয় বিমলা-দি, সদর দিয়ে ঢুকে কোন্ দিকে তোমাদের সিঁড়ি, আমাকে বলে' দাও—এখুনি যাচ্ছি। তোমাদের নিচেটায় তো ভাড়াটে থাকে, না?

বিমলা বলিল,—হ্যাঁ। কিন্তু এসেই বা তুমি কী করবে? আমি এই একেবারে কাছেই তো আছি তোমার। তুমি হাত বাড়িয়ে দিলে অনায়াসে আমি তা ধরতে পারি—এতো কাছে! বলিয়া কাঁধের উপর আঁচলটা গুটাইয়া বিমলা সত্যসত্যই তাহার ডান হাতখানি রাখালের দিকে বাড়াইয়া দিল।

তেমনি লজ্জিত মুখে রাখাল কহিল,—তোমার সঙ্গে অনেক যে আমার কথা ছিলো।

—কথা? তা ওখান থেকেই বলো না।

রাখাল আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল,—জেঠিমা তোমাকে দেখবার জন্যে একেবারে পাগল হ'য়ে আছেন, দিন-রাত্রি খালি কাঁদেন—একটা চিঠি পর্য্যন্ত তাঁকে লেখ না। একবার তোমাকে যেতে বলে' দিয়েছেন অনেক করে'।

বিমলা ঠোঁট কুঁচ্‌কাইয়া হাসিয়া উঠিল : এই কথা ? আমি ভাবছিলাম না-জানি কী !

রাখাল কহিল,—বিয়ের পর জোড়ে সেই যে প্রথম ফিরেছিলে, তারপর এই চার বছরের মধ্যে তোমাকে তিনি দেখেন নি। কী তাঁর কষ্ট ভাবো দিকি ? তোমার বুঝি একটুও কষ্ট হয় না ? নন্তু এখন কতো বড়ো হয়েছে, ব্যাগে করে' বই-শ্লেট বেঁধে দিব্যি আজকাল পায়ে হেঁটে পাঠশালা যায়, কতো মজার-মজার কথা বলে—তোমার তাকে দেখতে ইচ্ছে করে না ?

মুহূর্ত্তে বিমলার মুখ বিষণ্ণ হইয়া আসিল। তাহার মুখের বিষাদে গ্রামের আকাশে সন্ধ্যা নামিবার কোমল আভাটুকু স্পষ্ট দেখা গেল, দুইটি তরল চোখে তাহাদের ক্ষীণজল নদীটি যেন ছলছল করিয়া উঠিয়াছে !

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া বিমলা কহিল,—কিন্তু কে নিয়ে যাবে ?

কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া রাখাল কহিল,—কেন, আমি। আমিই তো নিয়ে যেতে পারি।

রাখালের স্বরানুকরণ করিয়া বিমলা বলিল,—তুমিই নিয়ে যেতে পারো। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমাকে এরা যেতে দেবে কেন ?

—যেতে দেবে না কী ! য়্যাদ্দিন হ'য়ে গেলো, একবারো বাড়ি গেলে না, জেঠিমা কেঁদে-কেঁদে হায়রান্‌ হচ্ছেন—নিশ্চয়ই যেতে দেবে। আমাকে ওঁরা কিছুতেই ফেরাতে পারবেন না। আমি ফিরলে তো ? ঠিক তোমাকে নিয়ে যাবো দেখো। আমি আজই তোমার শাশুড়িকে বলছি।

বিমলা হাসিয়া বলিল,—যদি তবু তারা যেতে না দেয়, তুমি জোর করে' আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারো?

প্রবল উৎসাহে রাখাল কহিল,—একশো বার পারি। কিন্তু অমনিই বা তাঁরা যেতে দেবেন না কেন?

—অমন পরপুরুষের সঙ্গে ঘরের বউকে কেউ যেতে দেয় নাকি কখনো?

বিমলা-দিদির কী যে ঠাট্টা করিবার ধরণ রাখালের তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই, মনে-মনে ক্লান্তি অনুভব করিয়া সে হাঁপাইয়া উঠিল। বলিল,—মাথামুণ্ডু কী যে তুমি বলো তার কিছু ঠিক নেই। আমি তোমার সেই রাখাল, গ্রামের সম্পর্কে তুমি আমার দিদি। কতো বড়ো আপনার জন। কে এতে আপত্তি করতে যাবে—কা'র এতো সাহস?

জান্‌লার একটা শিকের উপর গালের চাপ দিয়া বিমলা আবছা করিয়া কহিল,—কোথায় তুমি আমাকে নিয়ে যাবে শুনি?

—কোথায় আবার! বাড়িতে,—জেঠিমার কাছে।

অল্প একটু হাসিয়া তেমনি অস্পষ্ট স্বরে বিমলা বলিল,—ও! মোটে ঐ টুকুন্ পথ?

—তবে কোথায় তুমি যেতে চাও?

তেমনি অমনস্কের মতো বিমলা বলিল,—অনেক—অনেক দূরে। ঠিক জানি না কোথায় যেতে চাই। তুমি ছেলেমানুষ, অতোদূর তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে কেন?

রাখাল বলিল,—খুব পারবো, মেয়েদের গাড়িতে তোমাকে মাল-পত্র শুদ্ধ তুলে দিয়ে আমি পাশের গাড়িতে থাকবো—প্রত্যেক ষ্টেশনে খোঁজ নেব, তোমার একটুও অসুবিধে হ'বে না। গাঁ থেকে নতুন আসছি বলে' কী, পথ চল্‌তে এক্স্‌পার্ট হ'য়ে গেছি। তার পর কমলাসাগরে পৌঁছে নৌকা একবার নিতে পারলে আর আমাদের পায় কে। পরে ঢোঁক গিলিয়া সে হাসিয়া কহিল,—ছেলেমানুষ বুঝি কোনোদিন আবার পরপুরুষ হয়? নেহাৎ একটু লম্বা হ'য়ে পড়েছি, নইলে দু'বছর আগে বাবার সঙ্গে হাফ্‌-টিকিটে কুমিল্লা গিয়েছিলাম।

বিমলা অবাক হইয়া কহিল,—কমলাসাগর? সে তো আমাদের বাড়ির কাছে।

উৎফুল্ল হইয়া রাখাল কহিল,—হ্যাঁ, বাড়িতেই তো তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

বিমলা হঠাৎ আবার খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল: বাড়িতে কে যেতে চাইছে? ওখানে গেলে তো আবার ফিরে আসতে হ'বে। এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারো যেখান থেকে কোন দিন আর এ-মুখো হ'তে হ'বে না? তবেই বুঝি, হ্যাঁ, রাখাল আমার মানুষ হয়েছে। এমন কোনো জায়গা তোমার আছে?

রাখাল মনে-মনে বিমর্ষ হইয়া কহিল,—সে তো জানি এক শ্মশান, এতো সকালেই মরবার তোমার হয়েছে কী?

হাসিয়া কুটি-কুটি হইয়া বিমলা বলিল,—দূর্‌ বোকা, সখ করে' কে কবে মরতে চায় পৃথিবীতে? আর অমন মরণে সঙ্গী লাগে

নাকি ? আমি বলছিলাম কি, নিয়ে যে যাবে, আবার এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে না তো ?

রাখাল কহিল,—ফিরলেই বা। তবু অন্তত তিন চার মাস তো জেঠিমার কাছে থেকে আস্‌তে পারবে। এতো দিন পর বাড়ি ফিরে কতো তোমার ভালো লাগ্‌বে দেখো! তোমাদের বাগানে এবার কী ভীষণ জামরুল হয়েছে, বিমলা-দি! স্বচক্ষে একবার দেখবে চলো।

জান্‌লার থেকে শরীরের সান্নিধ্যটা শিথিল করিয়া গম্ভীর হইয়া বিমলা কহিল,—নিয়ে কী হ'বে ? এই তো আমি বেশ আছি।

—ছাই আছ। কাল রাতে তোমাকে তোমার স্বামী মারছিলো, আমি বুঝি বুঝিনি ?

পরম ঔৎসুক্যে, গরাদের ফাঁকে একটা হাঁটু গলাইয়া বিমলা শিকগুলির সঙ্গে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—তাই নাকি ? কী করে' তুমি বুঝলে ?

—বা, তুমি চেঁচিয়ে কাঁদছিলে না ? দেখলাম ধারে-পারে কেউ তোমাকে সাহায্য করবার নেই. এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে নিজে পর্য্যন্ত মাথা তুলছ না—পড়ে'-পড়ে' খালি মার খাচ্ছ, আর চেঁচাচ্ছ।

বিমলা কহিল,—সাহায্য করবার জন্যে কেঁদে-কেঁদে তোমাকেই ডাকছিলাম যে। তা. তুমি তো খালি বাড়ি নিয়ে যেতে চাও।

—চাইই তো। পড়ে'-পড়ে' তুমি এমনি মার খাবে নাকি ?

—কিন্তু আবার ফিরিয়েও তো দিয়ে যেতে চাও। আমি সুখে নেই তোমায় কে বল্‌লে?

দুই হাতে রাখাল তাহার দিকের জান্‌লার শিক ধরিয়া সবেগে নাড়িয়া দিয়া কহিল,—কিন্তু কেন উনি তোমায় মারবেন?

হাসির হাওয়ায় পাৎলা ফুরফুরে ঠোঁট দুইটি কাঁপাইয়া বিমলা বলিল,—মারবে না? তার নিজের জিনিস, যা কেন সে না করে। পরের ওপর তোমার এতো মায়া হয় কেন?

—বা, তাই বলে' তুমি মার খাবে?

—বা, দু'বেলা ভাত খেতে পাই না? সাধে কি আর তোমায় ছেলেমানুষ বলি, রাখাল? প্রহারটাও তো একরকম ভালোবাসা। এবার সরো, দোকান থেকে আসবার তাঁর সময় হ'লো—জান্‌লা খুলে পরের বাড়ির বৌর দিকে অমনি তাকাতে হয় না। লোকে কি বলবে? এবার যাই, আমাকে এখন আবার ওঁর খাওয়ার সামনে বসতে হবে।

রাগ করিয়া রাখাল জান্‌লাটা বন্ধ করিয়া দিল।

*

*　　*

কিন্তু রাত করিয়া বিমলা-দিদির সেই কান্না আবার সুরু হইয়াছে। রাতের পর রাত—এক রাতও শান্তিতে রাখাল

ঘুমাইতে পারিল না। বিমলা-দিদির এই পরাভবের লজ্জা সমস্ত শরীরে তাহার হুল ফুটাইতে লাগিল।

একদিন আর তাহার সহিল না, নিজেই ভাড়াটেদের উঠান ডিঙাইয়া সিঁড়ি চিনিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। উপরে, ধারে-কাছে কোথাও কাহাকে দেখা গেল না। কান্নার শব্দ শুনিয়া বিমলা-দিদির ঘর সে চিনিয়া রাখিয়াছে।

দুপুর বেলা। টিপি-টিপি পা ফেলিয়া রাখাল দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বিমলা কোলের সামনে পানের ডাবর লইয়া পান সাজিতে বসিয়াছে। রাখালকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সে গায়ের উপর অপরিচ্ছন্ন ক্ষিপ্র হাতে আঁচল গুটাইয়া মাথার উপর প্রকাণ্ড এক ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। পরক্ষণেই ঘোম্‌টাটা পিঠের উপর ফেলিয়া দিয়া হাসিয়া কহিল,—আমি ভাবলাম নিরালা দুপুর-বেলায় কে না-জানি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তারপর চেয়ে দেখি না রাখাল। এতো সাহস তোমার!

রাখাল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—নিশ্চয়। দিদির কাছে আসতে ছোট ভাইর আবার সাহস লাগে নাকি?

—তা এসো, এসো। দরজাটা বাপু বন্ধ করে' দি—কে কখন দেখে ফেলে কিছু ঠিক নেই।

রাখাল ঈষৎ ব্যস্ত হইয়া কহিল,—দেখলেই বা। এমন-কিছু অন্যায় তো আর করছি না।

দরজায় খিল চাপাইতে-চাপাইতে বিমলা বলিল,—তবু লোকের

চোখকে বিশ্বাস নেই। কি দেখতে কী দেখে কিছু ঠিক আছে? ন্যায়-অন্যায় যাই হোক্, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো।

সামনের তক্তপোষে রাখাল বসিল। ঘর-দোরের কোথাও এতটুকু শ্রী নাই, •বিমলা-দিদিও তাহার চেহারায় ও পোষাকে এই ঘরের সঙ্গে চমৎকার একটি সামঞ্জস্য রাখিয়াছে।

রাখাল কহিল,—এই ক'দিন থেকে জান্‌লা আর খুলছ না কেন? আর তো তোমাকে দেখতে পাই না।

পান সাজিয়া তাহাতে একটা লবঙ্গ ফুঁড়িয়া বিমলা কহিল,—দেখতে পেলেই বা কি করতে পারো তুমি? কতোটুকু তোমার সাধ্য! জান্‌লা খুলে রেখেই বা কি লাভ?

—এই কথা? রাখাল তক্তপোষ ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল: দরজাটা খুলে দাও না একবার। কোথায় তোমার শাশুড়ি—এক্ষুনি তাঁর মত নিয়ে এই মুহূর্ত্তে তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি।

বিমলা তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া হাসিয়া কহিল,—শাশুড়ির মত নিয়ে? আর সাহস দেখিয়ে কাজ নেই। নাও, পানটুকু খেয়ে ফেল। বলিয়া পান-শুদ্ধ আঙুল দুইটা সে রাখালের মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিতে গেল।

রাখাল কহিল,—বেশ তো, নাই বা পেলাম মত—তুমি চলে' এসো আমার সঙ্গে। তোমাকে নিয়ে দিব্যি আমি সরে' পড়তে পারি, বিমলা-দিদি।

—কোথায়? বলিয়া হাসিতে-হাসিতে বিমলা রাখালকে তাহার পাশে তক্তপোষের উপব বসাইয়া দিল।

রাখাল কহিল,—সটান জেঠিমার কাছে। তোমার জন্যে বেচারির কান্না মনে করলে আমি থাকতে পারি না।

তাহার একখানা হাত কোলের উপর টানিয়া লইয়া বিমলা কহিল,—বাপের বাড়ি যাবার জন্যে অতো হাঙ্গাম আমার পোষাবে না, রাখাল। যাবার চমৎকার জায়গাই বের করেছ দেখছি।

—কোথায় তুমি যেতে চাও তবে?

হঠাৎ রাখালের হাতটা দুই হাতের মধ্যে জোরে চাপিয়া ধরিয়া বিমলা বহিল,—যেতে আমি সত্যিই চাই নাকি?

—না, তা চাইবে কেন? পড়ে'-পড়ে' মার খেতে পারো। তুমি কী হ'য়ে গেছ বলো তো? নিজে বেরিয়ে পড়তে পারো না? কিসের এই অভিনয়!

রাখালের মাথাটা একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বিমলা সজল চক্ষে কহিল,—নিজে বেরিয়ে পড়ে'ই বা যাবো কোথায়? খেতে দেবে কে—কোথায় আশ্রয় পাবো? আবার হেঁট হ'য়ে ফিরে আসতে হ'বে।

—আবার আসবে কেন?

—যাতে আর না আসতে হয় তেমন লোক আমি কোথা পাবো বলো?

রাখাল সবলে আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া কহিল,—চলো, আমিই সেই লোক। আপাততো তোমাকে জেঠিমার কাছেই রেখে আসি চলো, দেখবে তোমার পতিদেবতাটি দিব্যি সুড়-সুড়্ করে' পায়ের তলায় এসে পড়েছেন দু'দিনে। আর

যদি না-ই আসেন, নিজের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হ'য়ে তখন দাঁড়াতে পারবে। অত্যাচারের কাছে কিছুতেই মাথা নোয়াবে না।

বিমলা হাসিয়া কহিল,—মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ পর্য্যন্ত। পাগল! কিসের কী অত্যাচার! তারপর দুই ব্যাকুল হস্তে রাখালকে প্রাণপণে বুকের উপর আকর্ষণ করিয়া তাহার স্তম্ভিত মুখের উপর দুইটি বিশাল চক্ষু নামাইয়া বিমলা কহিল,—তুমি আমার সেই লোক নও, রাখাল।

উন্মত্ত স্পর্শের সমুদ্রে পড়িয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে রাখাল কহিল,—আমিই সেই লোক। তোমাকে আমি সাধ্যমত সাহায্য করবো দেখো। ম্যাট্রিকটা অনায়াসে পাস করিয়ে দিতে পারবো—তারপর তুমি নিজেই একটা চাকরি পেয়ে যাবে। চেষ্টা করলে তিন-চার বছরেই তুমি পাস্ করতে পারবে। তখন তোমাকে পায় কে! লবডঙ্কা!

বিমলা নুইয়া পড়িয়া রাখালের চুলে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে কহিল,—এতো হাঙ্গাম আর পোষাবে না, রাখাল। চাকরি তো এইই চমৎকার করছি কতো বছর। পেন্‌সান্-এরো বন্দোবস্ত আছে।

রাখাল কহিল,—না। তোমার এই মরণ আর আমি দেখতে পারি না, বিমলা-দি। তুমি চলো।

বিমলা রাখালের সার্টের গলার বোতামটা আঙুল দিয়া ঘুরাইতে-ঘুরাইতে কহিল,—যাবার জন্যেই তো বসে' আছি। কিন্তু যেখানে যেতে চাই সে-পথের সঙ্গী তুমি আমার নও,

রাখাল। নিয়ে গিয়ে মিছিমিছি পথের মাঝখানে আমাকে ফেলে দেবে তো! আমি তখন করি কী!

—কক্‌খনো না। আমি তোমার তেমন রাখাল নই, চিরকাল তোমার পাশে-পাশে থাক্‌বো, বিপদ এলে আমিই বুক দিয়ে দাঁড়াবো। তোমার গায়ে একটুও আঁচড় লাগতে দেবো না।

রাখালের কপালের উপর সস্নেহে গাল পাতিয়া রাখিয়া বিমলা কহিল,—কিন্তু আমার কী আছে যে যার জন্যে কোনদিন তুমি আমাকে ছাড়বে না ভাব্‌ছ? মার খেয়ে-খেয়ে চেহারাটা তো পোড়াকাঠ হ'য়ে গেছে।

—কী আছে? তুমিই নিজেই জানো না বিমলা-দি, সত্যিকারের মানুষ হ'বার ইচ্ছাকে তুমি মনের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছ। ছাড়ো, ছাড়ো—কী যে তুমি—

বিমলা তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল,—তোমার সঙ্গেই বা আমি যেতে চাইবো কেন? কী তোমার আছে? তুমি তো পুঁচকে একটা ছেলে।

রাখাল হতভম্বের মত বসিয়া রহিল।

এবং পরক্ষণেই বিমলা দরজাটা খুলিয়া দিয়া কহিল,—যাও।

সে যে হঠাৎ কী অপরাধ করিয়া বসিল, রাখাল তন্নতন্ন করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বিমলা ধমক দিয়া উঠিল: যাও বল্‌ছি। খেয়ে-দেয়ে তো আর কোনো কাজ নেই, দরজা বন্ধ করে' শুয়ে-শুয়ে ওঁর সঙ্গে খোসগল্প করা হচ্ছে। গেলে?

নিশি-পাওয়া স্বপ্নগ্রস্তের মতো রাখাল আস্তে-আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

*

* *

জানালাটা তেমনি বন্ধ হইয়া আছে—বিমলা-দিদির আর দেখা নেই। মাঝে-মাঝে রাত্রে সেই অসহায় আর্ত্ত চীৎকারে তাহার অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে।

তাহার সঙ্গে যাইতে বিমলা-দিদির আপত্তি নাই, কেবল সে আর ফিরিয়া আসিতে চায় না। নাই বা ফিরিয়া আসিল! পৃথিবীতে স্থান এত সঙ্কীর্ণ নয়, অনায়াসে সে জায়গা করিয়া নিতে পারিবে। সংসারে কত কাজ করিবার আছে, এই রিক্ততা উত্তীর্ণ হইয়া বিমলা-দিদিরো আশ্রয় মিলিবে। সামান্য খাইবার পরিবার ভাবনা! দিকে-দিকে কত মেয়ে কত কাজে বাহির হইয়া পড়িল—কত কঠিন সংগ্রাম ও নিষ্ঠুর তপস্যার মধ্যে—বিমলা-দিদি তাহাদের চেয়ে কম কিসে! এখনো তাহার সেই দুঃসাহসী যৌবনের শিখা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শিখাকে একটু অনুকূল বাতাসের প্রশ্রয় দিলেই তাহা দিক্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া সমস্ত দেশকে উজ্জ্বল করিতে পারিবে। নিজে সেই দুর্বার দুর্দ্ধর্ষ যৌবনের উপাসক হইয়া

বিমলা-দিদিকে সে তিলে-তিলে এমন করিয়া মরিতে দিতে পারে না।

এবং আরেক দিন সে পা টিপিয়া-টিপিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

হ্যাঁ, বিমলা-দিদিকে সে নিয়া যাইতে আসিয়াছে। অবারিত উন্মুক্ত আকাশের নিচে—সংগ্রামময় মহা-জীবনের মাঝখানে। নির্জ্জীবের মতো তাহাকে সে ঘুমাইতে দিবে না।

বিকাল হইয়া আসিয়াছে—তা হোক্। কাহারো সঙ্গে যদি মুখোমুখি দেখা হইয়া যায়, ভালোই হইবে। সমস্ত বাধা-বিপদকে পরাস্ত করিয়া বিমলা-দিদিকে সে ছিনাইয়া লইয়া আসিবে। হয় তো তাহার কোনো দরকার করিবে না। স্বরটা নরম করিয়া বিমলা-দিদিকে নিতে চাহিলেই তাঁহারা ছাড়িয়া দিবেন। বিয়ের পর সমানে চারিটি বৎসর সে বাপের বাড়ি যায় নাই। এতদিনে নিশ্চয়ই তাঁহাদের রাগ পড়িয়া গেছে।

রাখাল বারান্দা ধরিয়া সরাসরি বিমলার ঘরের উদ্দেশেই যাইতেছিল, পেছন হইতে নিদারুণ স্ত্রীকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল : কে ?

রাখাল ভয়ে-ভয়ে ফিরিল। দেখিল একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক কোশাকুশি লইয়া সন্ধ্যায় বসিয়াছেন। ইনিই যে বিমলা-দিদির শাশুড়ি তাহাতে ভুল নাই। রাখাল দুই পা কাছে আসিয়া বলিল,—আমি বিমলা-দির বাপের বাড়ি থেকে আসছি। আমার নাম রাখাল।

প্রৌঢ়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মুখ ঝাম্‌টা দিয়া কহিলেন,—তা কথা-বাত্রা নেই, সপাসপ্‌ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছিলে যে। বিমলা কোন্‌ ঘরে থাকে তা তুমি আগে থেকেই জান্‌তে নাকি?

রাখাল কুণ্ঠিত হইয়া কহিল,—আপনাকে আগে দেখ্‌তে পাইনি। আমি আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলাম। বিমলা-দিকে নিয়ে যেতে তাঁর মা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। গ্রাম-সম্পর্কে আমি তাঁর ছোট ভাই। বলিয়া আরো কাছে আসিয়া রাখাল প্রৌঢ়াকে প্রণাম করিবার জন্য নত হইবার ভঙ্গি করিল।

প্রৌঢ়া দুই পা হটিয়া গিয়া কহিলেন,—কোথাকার কে—বদমাস্‌ না চোর—ফাঁকা পেয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে—দাঁড়াও একবার। বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিবার রাস্তা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া নিচের দিকে তাকাইয়া তিনি তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলেন: গণেশ-নকুল কেউ আছে নিচে, বড় বৌ? একবার পাঠিয়ে দাও দিকি শিগ্‌গির—দরজা খোলা পেয়ে কে-না-কে একটা লোক ঢুকে পড়ছে ওপরে!

ভীতস্বরে রাখাল বলিল,—বিমলা-দিকে ডাকুন না। তিনি আমাকে ঠিক চিন্‌তে পারবেন।

—চেনাচ্ছি আমি। কই, কেউ এলো না?

রাখাল আবার কহিল,—আমি ওঁকে ওঁর বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছিলাম। কুটুম্বের বাড়ি—নিচে কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে ওপরে এসে পড়েছি।

কর্কশতর কণ্ঠে প্রৌঢ়া কহিলেন,—নিয়ে যেতে এসেছ, পণের বাকি টাকা নিয়ে এসেছ তো সঙ্গে করে’?

—সে-সব তো আমি জানি না কিছু।

—আমি বেয়ান্‌কে বলে’ দিই নি বাকি সাত শো টাকা না পেলে ইহজন্মে মেয়ে পাঠাবো না? দাঁড়াও, জানাচ্ছি তোমাকে। কই বড়-বৌ, নকুল-গণেশ কেউ বাড়ি নেই?

রাখাল গুটি-গুটি আগাইয়া আসিল। কহিল,—তার চেয়ে বিমলা-দিকে ডেকে পাঠান্। তিনি এলেই তো সমস্ত সন্দেহ কেটে যায়।

—সে তোমার জন্যে বাক্স-বিছানা গুছিয়ে বসে’ আছে নাকি? এই মাত্র সে বায়স্কোপে গেলো।

—বায়স্কোপে গেলো? রাখাল অবাক হইয়া গেল: কা’র সঙ্গে?

প্রৌঢ়া দাঁত খিঁচাইয়া উঠিলেন: কেন, তার সঙ্গে যাবার লোকের অভাব আছে নাকি? তার সোয়ামি নেই?

—তা বেশ, আমি আরেক দিন আস্‌বো। বলিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রৌঢ়াকে এক-রকম ঠেলিয়া দিয়াই পথ করিয়া সে নিচে নামিয়া গেল।

এবং বায়স্কোপ হইতে বিমলারা ফিরিলে সে-রাত্রে পাশের বাড়িতে কী যে তুমুল কাণ্ড ঘটিয়া গেল রাখাল তাহার এক বর্ণও জানিতে পারিল না। মুখ রক্ষা করিবার জন্য বিমলাকে যে সে কী নির্লজ্জ জবাবদিহি দিতে হইয়াছে তাহা জানিয়া

তাহার কাজও নাই। শুধু রাত্রির কণ্ঠে বিমলা-দিদির সেই করুণ চীৎকার শুনিবার আশায় সে উৎকর্ণ হইয়া মুহূর্ত্ত গুনিতে লাগিল।

কিন্তু বিমলা-দিদির কণ্ঠে আজ আর কোনো অভিযোগ নাই। বোধ হয় স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া পরম আনন্দে বায়স্কোপেরই গল্প করিয়া চলিয়াছে।

*

* *

আশ্চর্য্য,—পরদিন সকাল বেলায়ই ও-পারের জানালাটা খুলিয়া গেছে।

এ-পারে জান্‌লার কাছে চেয়ার টানিয়া রাখাল পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ তাহার কোলের উপর গুলি-পাকানো এক টুকরা কাগজ আসিয়া পড়িল। চম্‌কাইয়া চাহিয়া দেখিল কাগজটা সন্তর্পণে ছুঁড়িয়া দিয়া বিমলা-দিদি ঠোঁট টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে জানালাটা ফের বন্ধ করিয়া দিতেছে।

কুঁচ্‌কানো কাগজটা রাখাল প্রসারিত করিয়া দেখিল—একটা চিঠি। পেন্সিলে তাড়াতাড়ি করিয়া লেখা। নিচে বিমলা-দিদির নাম।

চিঠিটা রাখাল একনিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল :

তুমি আজ রাত ঠিক দশটার সময় ওপরে চলে' আসবে। সদর আমি খুলে রাখবো। তুমি এলে তোমার সঙ্গে এ-বাড়ি থেকে তক্ষুনি পালাবো। আর আমার কেউ নেই। এসো কিন্তু ঠিক দশটার সময়। ভুলো না।

চিঠি পাইয়া রাখাল লাফাইয়া উঠিল। এত অত্যাচারে এত দিনে বুঝি বিমলা-দিদি মানুষ হইলেন।

এত রাত্রে কোথায় কোন ট্রেন, রাখালের কিছু জানা নাই। পরে জানিলেও কিছু ক্ষতি হইবে না—বিপদের ভয়ে এমন একটা অসাধ্যসাধনের গৌরব হইতে সে বঞ্চিত হইবে ইহা সে ভাবিতেও পারিল না।

জীবনে এইটুকু বিপদের সম্ভাবনাকে সে হাসিমুখে গ্রহণ করিতে পারিবে না তো পুরুষ হইয়া সে জন্মিয়াছিল কেন? সে ছাড়া বিমলা-দিদির আর কেহ নাই। বিমলা-দিদিকে সে-ই মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছে।

বই কিনিবার টাকাটা ভাগ্যিস্ কাল আসিয়া পড়িয়াছিল। পেট-কাপড়ে সেই টাকাটা রাখাল বাঁধিয়া লইল। ঘড়িটা ঠিক চলিতেছে তো?

সদর দরজাটা খোলাই রহিয়াছে—নিচেটা একেবারে নিঝুম, অন্ধকার। সকলে ইহারই মধ্যে ঘুমে বিভোর।

পা টিপিয়া-টিপিয়া চোরের মত রাখাল উপরে উঠিতে লাগিল।

বারান্দায় অন্ধকারে বিমলা-দিদিকে দেখা গেল। প্রস্তুত হইয়া তাহারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

প্রবল উত্তেজনায় রাখালের সমস্ত শরীর কাঁপিতে সুরু করিল।

কিন্তু বিমলা-দিদি তাহাকে দেখিতে পাইয়াও কাছে না আসিয়া কেন যে তাহাকে হাতছানি দিয়া ইসারা করিয়া গেল তাহা সে একেবারেই বুঝিতে পারিল না। আর, নিজে নিচে না নামিয়া কেনই বা যে তাহাকে উপরে ডাকিয়া আনিল তাহাও তাহার বুদ্ধির অগম্য। রাখাল আস্তে-আস্তে বিমলার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঘরে আলো জ্বালাইয়া বিমলা-দিদি তাহার জিনিস-পত্র গুছাইতে বসিল নাকি? রাখাল অস্থির হইয়া উঠিল। জিনিস-পত্র লইয়া কী হইবে!

দরজার সামনে রাখালকে দেখিতে পাইয়া বিমলা হঠাৎ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল: ওগো, শুনেছ? শিগগির ওঠ, সুড়্‌সুড়্‌ করে' দিব্যি এসে গেছে।

হীরালালের তন্দ্রা আসিয়াছিল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। অন্ধ চোখে রাখাল নিস্পন্দ হইয়া ঘরের মধ্যে তেমনি চাহিয়া আছে।

হীরালাল বাহিরে আসিয়া দুই হাতে দুর্ব্বল রাখালের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিল। সেই প্রভূত শক্তির বিরুদ্ধে রাখাল সামান্য একটি আঙুলও তুলিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি আলো লইয়া বিমলা তাহার শাশুড়িকে জাগাইতে গেল। চেঁচামেচি শুনিয়া নিচে হইতে গণেশ-নকুলও লাঠি-সোটা লইয়া হাজির হইয়াছে।

মুখের কাছে লণ্ঠন তুলিয়া বিমলার শাশুড়ি কহিলেন,—এই তো, সেই ছোঁড়া। বৌমার গাঁয়ের লোক বলে' কাল সন্ধ্যায় চুরি করতে ঢুকে' পড়েছিলো। চেনো নাকি ওকে?

বিমলা ঘরে ঢুকিতে সাহস পায় নাই; বারান্দা হইতে কহিল,—আমি কী করে' চিন্‌বো? গাঁয়ের লোক না হাতি! পাশের বাড়িতে থাকে, আর জান্‌লা দিয়ে চিঠি ছুঁড়ে মারে। এইটুকুন বয়সে কী বিচ্ছিরি স্বভাব! ভদ্দরলোকের ছেলে নাকি?

হীরালাল মেঝের উপর রাখালের মাথাটা ঠুকিয়া দিতে-দিতে কহিল,—আজ স্বহস্তে চিঠি লিখে যে বাছাধনকে নিমন্ত্রণ করে' পাঠিয়েছিলাম। ঠিক এসে পড়েছে। কী চাঁদ, পরের বউকে বাড়ির বার করে' নিয়ে যাবে না?

শাশুড়ি কহিলেন,—তবে ও তোমার নাম জান্‌লো কী করে', বৌমা?

উত্তর দিল হীরালাল: পাশাপাশি বাড়ি থাকে, নাম জান্‌তে কতোক্ষণ? দিদি পাতিয়েছেন। দিদির সঙ্গে তোর এই কাণ্ড? থানায় একটা খবর দিয়ে আয়, নকুল।

থানায় খবর দিবার আগে হাতের লাঠিটা দিয়া রাখালের মাথায় কয়েকটা খোঁচা দিলে নকুলের কিছু ক্ষতি হইবে না।

গণেশ বলিল,—পুলিসে জানাজানি করলেই একটা কেলেঙ্কারি। কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে বিদেয় করে' দিন্।

শাশুড়ি কহিলেন,—পাশের বাড়িতে থাকে—মধুসূদন বাবুদের কেউ হয় নাকি? ওঁকেই খবর দেন না।

হীরালাল বলিল,—ক' দিন থেকেই দেখি পূবের জান্‌লাটা বন্ধ। ব্যাপারটা বিমলা বল্‌লে। তারপরে কালকের সেই ব্যাপার। খুব ফাঁদে ফেলেছি, যাদু! নিজের হাতে দিব্যি গোল-গোল অক্ষরে প্রেমপত্র লিখে পাঠিয়েছি। এখন কেমন লাগছে? বলিয়া সবাই মিলিয়া তাহার উপর আরেক পশ্‌লা চড়-চাপড় চালাইল। রাখাল একটিও কথা কহিল না, বিমলা-দিদিকে দেখিবার জন্য কাতর সজল চোখে চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

শাশুড়ি কহিলেন,—ছেড়ে দে এবার। আর কতো মারে! মধুসূদনবাবুকে খবর দিলেই তো হয়।

নকুল কহিল,—আমরা আছি কী করতে?

বারান্দা হইতে বিমলা কহিল,—সাবধান করে' বাড়ির বের করে' দাও। নিজেই শুধ্‌রে যাবে'খন! ফের কিছু করলে মধুসূদনবাবুকে খবর দেওয়া যাবে। লাঞ্ছনা আর কম হয়নি।

শাশুড়ি প্রতিধ্বনি করিলেন: হ্যাঁ, ঢের হয়েছে। এবার ছাড়্।

হীরালাল বিমলাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল: রাখালকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—পা ছুঁয়ে প্রণাম কর, বলছি। নাকে খত্ দে—আর কোনদিন এমন কাজ করবি নে।

বিমলা-দিদিকে প্রণাম করিতে রাখালের লজ্জা কী! দুই হাতে পা দুইটি জড়ো করিয়া রাখাল তাহার মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দাঁড়াইতে গিয়া দেখিল সারা গায়ে তীব্র ব্যথা করিতেছে। অশ্রু-আপ্লুত চোখে একবার বিমলার মুখের দিকে তাকাইল, কিন্তু সে মুখের একটি রেখায়ও সে কোনো ইসারা পাইল না। ভারি গলায় কহিল,—মামাকে জানিয়ে কিছু লাভ নেই, আমি কাল ভোরেই ও-বাড়ি ছেড়ে উঠে যাবো। আপনাদের শান্তি আর নষ্ট করতে আসবো না। আমাকে এবার যেতে দিন। বলিতে-বলিতে দুই চক্ষু দিয়া তাহার ঝর-ঝর করিয়া জল নামিয়া আসিল।

আরো অনেক কিছু সে বলিতে পারিত, কিন্তু বিমলা-দিদিকে অকারণে কষ্ট দিয়া কিছু লাভ নাই। অন্তত এই রাতটাও যদি বিমলা-দিদির না-কাঁদিয়া কাটে, তাহাই বা মন্দ কী! সকল কুৎসিত সন্দেহ হইতে বিমলা-দিদিকে নিষ্কৃতি দিবার জন্য এই লাঞ্ছনাটুকু সহ্য করিতে তাহার কষ্ট হইতেছে না।

অন্ধকারে টলিতে-টলিতে সিঁড়ি বাহিয়া রাখাল নিচে নামিয়া আসিল। ডান দিকের ভুরুর উপরে খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে— রুমাল দিয়া তাহাই সে মুছিতে গেল। রুমালের নিচে সযত্নে সেই চিঠির টুকরাটা এখনো গুলি পাকাইয়া আছে। চিঠিটা সে রাস্তায় ছুঁড়িয়া মারিল। বিমলা-দিদিকে তাঁহার স্বামীর এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোথায় সে লইয়া যাইত? সংসারে ইহা ছাড়া তাহার আর কোথায় আশ্রয় থাকিতে পারে!

উপজীবিকা

লিখ্‌তে-লিখ্‌তে হঠাৎ একটা লাইনের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়তে হ'লো! চাকা আর চলছে না। বুঝলাম কল কোথাও বিগড়ে গেছে—ভালো হজম হচ্ছে না, বা রাত্রে একটুও ঘুমুতে পারি নি, বা সারাটা দুপুর আজ মেঘ্‌লা করে' আছে, সেই জন্য নয়, শারীরিক বা প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতার অনেক উর্দ্ধে আমি উঠে এসেছি—অথচ কারণটা যে কী তা কে বলবে? এমনি হয়, অনবরত ব্যাট চালাতে-চালাতে হঠাৎ একটা বল ব্রেক্‌ করে' এসে মিড্‌লষ্টাম্পটা উড়িয়ে নিয়ে যায়—কারণ জিজ্ঞাসা করবার পর্য্যন্ত সময় হয় না। অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ বিশ্রমালাপে মাঝে এক-এক সময় সামান্য একটা অঙ্গুলি-ভঙ্গির দৌরাত্ম্য ঘটলে সমস্ত সুর যায় কেটে, সান্নিধ্যের তাপ হ'য়ে আসে নিষ্প্রভ। এমনি হয়, সৌরজগতে এ একটা দুর্ঘটনা। নিয়তির এ একটা অতি-ব্যবহৃত পুরানো পরিহাস।

আবৃত্তি করতে-করতে হঠাৎ এক জায়গায় ঠেকে গেলে আগের লাইনটা বারে-বারে আওড়ে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায় দেখেছি—আগের লাইনটার উচ্চারণের উত্তাপে পরের স্তিমিত, মুহ্যমান লাইনগুলি আস্তে-আস্তে সাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। লিখতে-লিখতে লাইনটা যেখানে আধখানা হ'য়ে ভেঙে গেছে—তারই ওপর ঘন অভিনিবেশের সঙ্গে, সমস্ত চেতনা তীক্ষ্ণ, কেন্দ্রীভূত করে' কলমের দাগা বুলোতে লাগলাম,—কিন্তু এ তো মাত্র স্মৃতি নয়, এ সৃষ্টি: আবৃত্তি নয়, অভূতপূর্ব্বতা—তাই কলমের এতো সহানুভূতিশীল

প্রক্রিয়াসত্ত্বেও একটি অক্ষরো চোখ মেললো না। চুরুটের পুরু ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো, হাতের কাছে এটা-ওটা বই হাট্‌কাতে লাগলাম, স্মেলিঙ সল্‌ট্‌ শুঁকলাম, ঘড়ির কাঁটা অপ্রতিবাদে অনায়াসে ঘুরে যেতে লাগলো। অস্থির হ'য়ে ঘরময় পাইচারি সুরু করলাম, কিন্তু শরীরের সক্রিয়তায় কল্পনা উজ্জীবিত হ'ল না, মনের ওপর কোথা থেকে যে ঘোলাটে মেঘে গুমোট করে' এলো তা'র অপসারণের সম্প্রতি আর কোন আশা নেই। অথচ, শেষটা কী হ'বে জানা থাকলেই ছোট গল্প লিখতে আর পরিশ্রম নেই—কোনোরকমে সেখানে এসে পৌঁছুলেই হ'লো। যতো সর্ট কাট্‌, ততো তার গুরুত্ব। আশ্চর্য্য, আমি আমার গল্পের শেষ জানি—স্বয়ং বিধাতা পর্য্যন্ত জানেন না কোথায় তাঁর সৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে, কী তার রূপ, কী তা'র শূন্যতা—শুধু শেষ নয়, কোথায় কে কী বলবে, বা বলবে না, কী করতে চেয়ে আর কী কখন করে' বস্‌বে, সব আমার নখদর্পণে। তবু কি না এক লাইনো আর লিখতে পারছি না। কেবল কথাই স্তূপ করে' আছে, কিন্তু যে-প্রাণ বিভিন্ন অবয়বকে সক্রিয়, স্পন্দমান রেখে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করে—সেই সুরই কোথায় হারিয়ে গেলো। খালি কথা আর কথা—নীরস, নিষ্ঠুর, মৃত মাংসস্তূপ—কোথাও এতোটুকু সুরের লাবণ্য নেই—রূপের যে-বিকাশ উগ্র উদ্ঘাটনে নয়, অতি ক্ষীণ সঙ্কেতের সীমাহীনতায়, তা'রই আর কোনো সন্ধান পাচ্ছি না।

আশা ছাড়তে হ'লো। সেই মুহূর্ত্তের জন্যে আবার মনের নিরালায় বসে' প্রতীক্ষা করতে হ'বে। কখন তা আবার আসে কে জানে! কিন্তু ঘড়িতে মোটে এখন তিনটে—আর দু'টি পৃষ্ঠা মাত্র লিখতে বাকি ছিলো। ভাঙা লাইনের মুখে ঠিক কথাটি পেলে আর আমাকে ঠেকৃতে হ'তো না,—'বল' এতদুর কাটিয়ে এনে এখন মাত্র 'গোলে' 'স্যুট্' করা বাকি, কিন্তু 'বল' ঠিকমতো পায়ের ওপর না এসে পড়লে কি করতে পারি! একটি মাত্র অনুকূল সুর, উড্ডীন বিস্ফারিত পালে একটু মাত্র চঞ্চল হাওয়া, তার পর কে আমাকে রুখ্‌তো? যেখানে এসে সমাপ্তির রেখা টেনে দিতাম সেখানেই দিগন্তরেখায় আকাশের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের মতো বিরাট রসসমুদ্রের তীর দেখা যেত। সেই তীরের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে মুহূর্ত্তের পাখায় আবার আমাকে ভর করতে হ'বে। কিন্তু সেই রসসমুদ্রবিহারী মুহূর্ত্ত-বিহঙ্গের দল আমার মনের আকাশ থেকে অসময়ে আজ বিদায় নিয়েছে।

হঠাৎ বন্ধ দরজায় ঘা পড়তেই ভেতরে-ভেতরে ভারি আরাম পেলাম। নিজের এই অকৃত সাধনার চমৎকার একটা সাফাই পাওয়া যাবে। রমেনই হয়তো এসে থাকবে, এবং ঘরের ভেতরে আমি লিখতে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি ভেবে হঠাৎ সে ঢুকে পড়তে একটু দ্বিধা করছে! বাঁচলাম; নইলে এতোটা সময় আমি করতাম কী! তার সঙ্গে এখন খানিকটা অটোয়া বা কমুন্যাল এওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করতে পারলে

মনের এই অস্বাস্থ্যটা দূর হ'ত—এবং আমি দেখেছি যখনই সাহিত্যের থেকে কথোপকথনচ্ছলে দূরে সরে' গেছি, সাহিত্য ততোই আমার সমীপবর্ত্তী হ'য়ে উঠেছে। কেননা রমেনের সকল তর্কের শেষ কথা ছিলো এই: তুমি সাহিত্যিক, গল্প-গুজব নিয়ে থাক, তুমি এর বুঝবে কী? তখন সাহিত্য ছাড়া সত্যিই আমার গত্যন্তর থাকে না।

তাই উৎফুল্ল হ'য়ে ডাকলাম: এসো। ধাক্কা দিলেই খুলে যাবে।

দরজা খুলে গেলো। এবং যে ঘরে ঢুকলো সে যে রমেন নয়, নিতান্তই সে যে প্রমীলা—তা যে গল্প না লেখে সেও অনায়াসে বুঝতে পারবে। কলমটা তবু হাতে ছিলো, সেটা তাড়াতাড়ি ক্যাপে বন্ধ করে' উঠে পড়লাম।

প্রমীলা বল্‌লে,—এ কী? লেখা হ'য়ে গেলো?

দেয়ালের দিকে চেয়ে শুক্‌নো গলায় বল্‌লাম,—না।

—না মানে? প্রমীলা প্রায় ধমকে উঠলো: সেই খেয়ে-দেয়ে এগারোটার সময় বসেছ—এখনো তোমার শেষ হয় নি? দেখি—বলে' সে টেব্‌লের ওপর ঝুঁকে পড়ে' প্যাড্‌টা ঘাঁট্‌তে লাগ্‌লো: মোটে এই তিন শ্লিপ্? বলো কী! কখন তবে শেষ হ'বে?

নিষ্ঠুর, মসৃণ গলায় বল্‌লাম,—আজকে আর শেষ হ'বে না।

—শেষ হ'বে না মানে? প্রমীলা অস্থির হ'য়ে উঠলো: আজ সন্ধ্যের আগে কোন্ কাগজের সম্পাদককে গল্পটা দিয়ে

তোমার দশ টাকা পাবার কথা না? আমি সেই আশা করে’ বসে’ আছি। এ-বেলায় যে চাল বাড়ন্ত—ভুলে গেছ এরি মধ্যে? খোকার একটা পালো, মালিশ করবার জন্যে আগুন করতে কিছু কাঠকয়লা, এক বাণ্ডিল—

চীৎকার করে’ উঠ্‌লাম: তোমাকে বলেছি না আমার লেখবার সময় ঘরে কখনো ঢুকতে পাবে না?

—কোন্ চুলোয় তবে যাবো? ক’টা ঘর তোমার আছে শুনি? এটা ছাড়া আর একটা তো মাত্র বারান্দা—গরমের তাতে ছেলেটাকে নিয়ে সারা দুপুর সেখানে কাৎরে মরছি, সেদিকে মশায়ের খেয়াল আছে? এতোক্ষণ জ্বালিয়ে এই অবেলায় ও ঘুমিয়ে পড়লো—বিছানায় যা হোক শুইয়ে দিতে হ’বে তো? ঘরে ঢুকবো না তো যাবো কোথায়? বা’র ক’রে দিলেই পারো তবে।

নিঃশব্দে চেয়ার টেনে ফের বস্‌তে হ’লো।

প্রমীলা বললে,—ছেলেটা ট্যা করলে তোমার লেখা হয় না, আমি ঘরে ঢুকলে তোমার লেখা হয় না, বৃষ্টি হ’লে তোমার লেখা হয় না—কী হ’লে তবে হয়? নাচতে না জানলেই উঠোন ব্যাঁকা। লিখতে পার না, তাই,—তার আবার অতো ফ্যাসান কিসের?

বাইরে গিয়ে দাওয়া থেকে খোকাকে তুলে নিয়ে এসে তক্তপোষের ওপর শুইয়ে দিয়ে প্রমীলা আমার টেব্‌ল ঘেঁসে দাঁড়ালো। বললে,—আর ক’ পৃষ্ঠা বাকি? তিন পৃষ্ঠা হয়েছে

তো? যা হোক্ করে' আর দু'টো পৃষ্ঠা লিখে শেষ করে' দাও। বাস, সামান্য দশ টাকার জন্যে সাত দিন ধরে' তুমি খাটছ—কিসের এতো হাঙ্গামা শুনি? সাত দিন ধরে' মাথায় তোমার আইডিয়া নেই—এদিকে সামনে দু'বেলা ভাত চাই—আইডিয়া যদি না আসে আবহাওয়া থাকে না, আবহাওয়া থাকলেও মেজাজ থাকে না, আর মেজাজ যদি বা থাকে, আমি একবার ঘরে এসে ঢুকলেই সব ভোজবাজি হ'য়ে যায়! পাঁচ আঙুলে ঘি চাই—এদিকে ভাঁড়ে যে মা-ভবানী বসে' আছেন খেয়াল আছে? হ্যাঁ, লেখো, আমি এবার যাই—দরজাটা বন্ধ করে' দেবো?

লেখার ওপর ঝুঁকে পড়ে' বললাম,—দরকার নেই।

প্রমীলা তার নির্ভুল প্রতিধ্বনি করলো: কাজকর্ম্মের সময় ঘর কতোক্ষণ আট্‌কা রাখা যায়! এখন আমাকে রোদে-দেয়া কাপড় তুলে আলনায় কুঁচিয়ে রাখতে হ'বে—ঘর ঝাঁট, চিমনি সাফ, বিছানা পাতা, কুটনো কোটা—কতো কাজ বাকি। আর পৃষ্ঠা দুয়েক লিখে ফেলতে কতোক্ষণ তোমার লাগবে? চাল নিয়ে এলে তবে উনুনে আগুন দেব। উনুন তো আর মিছিমিছি বসে' থাকতে পারে না। নাও, চট্‌পট্ সেরে ফেল—আমার হাতে যদি কলম চলতো তো একবার দেখে নিতাম।

সেই মুহূর্ত্তের জন্যে ধ্যান করার আমার সময় নেই। জীবনে কোনোদিন প্রেমের প্রতীক্ষা করি নি, মাত্র যৌনানুভূতির

স্বাভাবিক প্রয়োজনে বিয়ে করতে হয়েছে। তেমনি মনের এই অলস ভাবাকুলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে এ-ক্ষেত্রেও শরীরকেই ফের চঞ্চল, সবেগগামী, অসহ্য রকমে অসহিষ্ণু করে' তুললাম। মন না চায়, হাত্ তো চলে। মুহূর্ত্ত চলে' গিয়ে থাকে, সময় তো ফুরিয়ে যায় নি। রস আগে নয়, আগে রসনা। গল্প না হোক, লেখা তো হ'বে। কলমের মুখে রেখাঙ্কিত অক্ষরগুলি একের পর এক সন্নিবিষ্ট হ'তে লাগলো। নিষ্প্রাণ কতোগুলি শব্দের বাহিনী, কিন্তু কোথাও তাদের সংযত স্বরানুবর্ত্তিতা রইলো না।

প্রমীলা কাপড় কুচোতে-কুচোতে আপন মনে বক্‌ছে: একটা আধলাও যার সম্বল নেই সে নাকি এমন গাফিলি করতে পারে? তবু যদি বুঝতাম মাসে-মাসে কোথা থেকে বাঁধা একটা টাকা আসবে, পেটের ধান্দায় এমন হা-পিত্যেশ করে' বেড়াতে হবে না! আর এই লিখেই যখন রোজগার করতে হচ্ছে তখন আর-আর কেরানির মতো নিয়ম বেঁধে দশটা-পাঁচটাই বা কেন করবে না শুনি? কলমের আড় ভাঙতেই লাগে সাত দিন—তা মাত্র তিন পৃষ্ঠা লেখে ছুটি নেবার মতলোব? কাজে এমন কামাই করলে মাইনে মিলবে কোত্থেকে?

কান না পেতে অদম্য বেগে কলম চালালাম। দৌড়-প্রতিযোগিতায় আগের মোটর-বাইকটা কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় চালকের স্নায়ুতে-শিরায় উৎসাহের যে আগুন জ্বলে'

ওঠে—প্রতি মুহূর্তে অক্ষর থেকে অক্ষরান্তর উত্তীর্ণ হ'য়ে যেতে বেগের সেই অন্ধ উন্মাদনা অনুভব করছি। আর ক্রমশই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছি ভাবতে স্বস্তি বোধ হচ্ছে—রাত্রির গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে আর ভাবতে হ'বে না।

কোথায় আবার একটু থেমে পড়েছিলাম বোধ হয়, প্রমীলাকে আবার কি-একটা কাজে ঘরের মধ্যে আসতে হয়েছে। বলছে: লিখলেই যখন দু'-পাঁচ পয়সা আসে তখন বাবুর মতো বসে'-বসে' গেঁতোমি করলে কি চলে? এই তো সেদিন কোন্ দোকান নাকি এক ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস অনুবাদ করে' দিতে বলেছিলো—দিলেই হ'তো। পয়সা দিয়ে হচ্ছে কথা—নাম, নাম দিয়ে কি তুমি ধুয়ে খাবে? আর যাদের পয়সা হয়েছে, প্রতিষ্ঠা হয়েছে—তারা যদি ফ্যাসান করে' কখনো দু'কলম লেখে, দেখবে কেমন তাদের নাম-ডাক! সেই দিন যে কাঁসারিপাড়ার সংয়ের দল থেকে লোক এসেছিলো তোমাকে ছড়া বেঁধে দিতে, লিখে দিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত শুনি? তারা তো আর মন্দ টাকা দিতো না। হ'লো—এক পৃষ্ঠা হ'য়ে গেছে এরি মধ্যে? হ্যাঁ, সেই তো মুখে-মুখে গল্পটা আমাকে সেদিন বল্‌লে—এক রত্তি গল্প, দু'টি মাত্র তো তার কথা—লেখবার সময়ই বা এতো কলমে-কাগজে দাঙ্গা বেধে যায় কেন? ভাবের এতো বাবুগিরি না ফলিয়ে সোজাসুজি লিখে গেলেই তো হয়—মেয়েরা সবাই বুঝতে পারে।

ঘোড়ার জিনের সঙ্গে প্রায় নাক ঠেকিয়ে ঘাড় গুঁজে জকি যেমন ছোটে—নিজের গতির অগ্রবর্ত্তী দীর্ঘ একটা রেখা ছাড়া কিছুই যেমন তা'র চোখে পড়ে না, তেমনি টেব্‌লের ওপর নুয়ে পড়ে' অনন্যজ্ঞান উন্মত্ততায় কলম চালিয়ে চলেছি! লাইনের পর লাইন ভেঙে-ভেঙে চারদিকে ছিটিয়ে পড়ছে, জোড়াতাড়া দেবার সময় নেই: সময় নেই—এই তীক্ষ্ণ অগ্রগমনের প্রাবল্যে ঘনীভূত অনুভূতির আবহাওয়াটা ছিঁড়ে, ফেঁসে, টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে গেলো—যতো তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাই ততোই কেবল কথা বেড়ে যাচ্ছে, অসংলগ্ন অবান্তর কথা, ঘূর্ণ্যমান চাকার উৎক্ষিপ্ত ধূলিজাল! পথের অনাবশ্যক দীর্ঘতায় গন্তব্যস্থানটাও ক্রমশ সরে'-সরে' যাচ্ছে, কিন্তু কোথা দিয়ে যেতে হ'বে না জানলেও কোথায় যে ঠিক যাবো তা আমি রওনা হ'বার আগেই ভেবে নিয়েছিলাম। অথচ যাবার এই পথটুকুই এতোক্ষণ মনের গহন অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অন্ধকার এখনো কল্পনার দীপ্তিতে তরল হ'য়ে আসে নি, না আসুক, তবু অন্ধকার ঠেলেই আমাকে ছুটতে হচ্ছে।

মুটের মাথায় চা'লের বস্তা চাপিয়ে যখন বাড়ি ফিরছি, বলবো কি, উদরপূর্ত্তির নিদারুণ কুৎসিত ব্যায়ামের চিন্তাটা আমার জীবনের মহত্তর ক্ষুধাকে বিস্বাদ করে' তুললো। যা'র জন্যে সেই সুবর্ণ মুহূর্ত্তের জন্যে মনের গভীর ধ্যানময়তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে' ফেল্‌লাম, যা'র জন্যে বিপুলতর এক সম্ভাবনার

স্বপ্নকে ব্যর্থ করে' দিতে পর্য্যন্ত লজ্জা হ'লো না! মাত্র দু'মুঠো ভাত—একটি পরিপূর্ণ সুস্থ সুনিদ্রা, সংসারে একটু সমতল ও সহজ সামঞ্জস্য। এরি জন্যে, এই তুচ্ছ প্রাত্যহিক প্রয়োজনের ইন্ধন জোগাতে আমারি ভবিষ্যতের উজ্জ্বল এক পরিচ্ছেদ অনায়াসে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো! ডাক্তার হ'য়ে নিকট-আত্মীয়ের চিকিৎসা করতে গিয়ে মৃত্যু ঘটানোর চাইতেও দুঃসহ অনুশোচনার গ্লানি আমাকে একেবারে পাগল করে' তুলেছে। কলম নিয়ে আবার বসে' গেলাম!

ঘরে আলো জ্বলছে দেখে প্রমীলা খেঁকিয়ে উঠ্‌লো:

বল্‌লাম,—সেই গল্পটা শেষ পর্য্যন্ত ভালো হ'লো না। অনেক কথাই বল্‌লাম বটে, কিন্তু যা বলতে চেয়েছিলাম তাই বলা হ'লো না।

প্রমীলা বালিশের থেকে ঘাড় উঁচিয়ে জিগ্‌গেস করলে: কেন, সেই ছেলেটা শেষকালে মরলো তো? আবার কী?

—মরলো বটে, কিন্তু নিজেও বিশেষ বেঁচে উঠিনি। আমি বোধহয় আর কোনকালে লিখতে পারবো না, প্রমীলা।

প্রমীলা বল্‌লে,—আমিও তো তাই বলছি। কোনো আপিসে-টাপিসে ঢুকে যাও—মাসে কী আসবে না আসবে বুঝে একটা ব্যবস্থা করতে পারি। একি গদার মতো দুপুর-বেলা বাড়ির মধ্যে বসে' থাকা আর কলম চিবোনো—পাড়ার পাঁচজনে বলে কী?

তবুও অতিরিক্ত মনোযোগে লিখতে বসে' গেলাম দেখে

প্রমীলা ক্ষান্ত হ'য়ে বিছানায় পাশ ফিরলো। এই গল্পটা শেষ হ'লে যে টাকা আসবে তা দিয়ে তা'র এক জোড়া সাড়ি হ'তে পারে সেই আশায় সে আমার নিস্তব্ধতায় আর রসনাক্ষেপ করলো না।

কিন্তু কী লিখবো?

ল্যাম্পের পল্‌তেটা বাঁয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ডুবিয়ে দিলাম। মখ্‌মলের মতো নরম, ঘন অন্ধকার। অগণন তারা ফুটে আছে। কিন্তু কোথাও সেই মুহূর্তের আর দেখা নেই।

*

* *

কিন্তু সেই মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে' কতোকাল বসে' থাকবো? আবার খাতা-পত্র নিয়ে বসে' গেছি।

রমেন এসে আমার সাহিত্য-অধোগতির ভূয়সী নিন্দা করে' গেলো। সেই গল্পটার নির্লজ্জ অপঘাত-মৃত্যুতে সে নিদারুণ বিচলিত হ'য়ে পড়েছে—দিনের পর দিন এ আমি কী করে' চলেছি? কেবল নিজেকে ফাঁকি দিয়ে পাঠককে ঠকানোর এই দুষ্প্রবৃত্তি আমাকে পেয়ে বসলো কেন? অথচ আমার মাঝে সে অপার্থিব প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ দেখেছিলো—রাশি-রাশি জঞ্জালের চাপে তা নিভ্‌তে বসেছে। কলম ভোঁতা ও কালি জোলো হ'য়ে গেছে, ভাষার সে মোচড় নেই, ভঙ্গির সেই

তীক্ষ্ণতা নেই—কেবল অনর্গল উচ্ছৃঙ্খলতা! কেবল পৃষ্ঠা ভরাবার কায়দা! আমি যদি জান্‌তামই লেখা খারাপ হচ্ছে, তবে ওটা কুটি-কুটি করে' ছিঁড়ে উনুনে ফেলে দিলাম না কেন? না, পৃষ্ঠা-সংখ্যার ওপর আমার মায়া হয়? তার বদলে গল্পই যাক্ চুলোয়। এই তো? এই একমাত্র জায়গা, রমেন বল্‌লে, যেখানে দ্রুত ছুটতে গেলেই পিছিয়ে পড়তে হয়, এই একমাত্র জায়গা যার দাম তা'র অর্থমূল্যে নয়, তা'র অমূল্যতায়। এমনি করে' আর যেন নিজেকে আমি অপচয় না করি—আত্মানুকরণের মতো সাহিত্যিকের পক্ষে পাপ নেই, যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন বা বিস্মৃতির মতো শাস্তি সে কল্পনাও করতে পারে না। এখনো অবহিত হ'বার সময় আছে। সাহিত্যিকের পক্ষে সব সময়েই সময় আছে। বলে' সে আমার হাত থেকে কলম ছিনিয়ে নিলো; বল্‌লে,—বাঁধ্‌কে। যা-তা গুচ্ছের কতোগুলি আর লিখো না।

হেসে বল্‌লাম,—দেখো না এটা কী-রকম হয়! একই রক্ত থেকে উৎপন্ন হ'য়েও সবগুলি সন্তান সমান হয় না। সময় আছে—আমাদের পক্ষে তাই বড়ো ভরসা। সব সময়েই যদি লিখতে হয় তবে অমন দু'একটা বেফাঁস বাজে গল্প বেরোতে বাধ্য। বাজে লেখায় আমার পেট না ভরাতে পারলে ভালো লেখার তোমাদের রসপিপাসা কী করে' মেটাবো বলো?

কিন্তু সমালোচকের কোথাও এতোটুকু সহানুভূতি নেই। লেখকের জীবনের বদলে তা'র চরিত্রের জীবনই তা'র বড়ো

জিজ্ঞাসা। সমস্ত রূঢ় সত্যের ওপর সে অবাস্তব কল্পনার মাধুর্য্য বিস্তার করতে পারলো কি না সেই খানেই তা'র কৃতিত্বের আসল পরখ। আর কিছু সে দেখবে না, দেখতে চায় না—নেপথ্যের মানুষের বদলে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাকে সে সন্ধান করে।

তাই, রমেন চলে' গেলেও, নিরস্ত হ'লাম না। কাগজে-কাগজে এতোদিন যে কালির কলঙ্ক সঞ্চয় করেছি তা আজ এই অভিনব সৃষ্টির বর্ণচ্ছটায় সম্পূর্ণ আড়াল করে' দিতে হ'বে। সমস্ত পাপক্ষালন হ'বে একটি অমোঘ প্রায়শ্চিত্তে।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। অবসন্ন আলোয় অক্ষর আর অনুধাবন করা যাচ্ছে না। আকাশ সিগারেটের ধোঁয়ার মতো ফিকে নীল। চেয়ারে পিঠ পেতে চুপ করে' অঙ্গুলিধৃত কলমটার দিকে চেয়ে রইলাম।

লণ্ঠন নিয়ে প্রমীলা ঘরে ঢুকলো। বল্লে,—আজ রাত্রেই শেষ হ'য়ে যাবে তো? কাল সকালে টাকা জোগাড় করে' কিন্তু খোকার জন্য ডাক্তার নিয়ে আসতে হ'বে। বুঝলে? কথাটা কানে ঢুকলো?

বিরক্ত হ য়ে বল্লাম,—আচ্ছা, হচ্ছে, এখন তুমি যাও, রান্না করো গে।

—তা আমি যাচ্ছি। বলে' এটা-ওটা কাজ সেরে প্রমীলা বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো।

আগে-আগে, স্পষ্ট মনে আছে, ঠিক লিখতে না পারলেও শরীরময় লেখবার প্রেরণা নিয়ে চুপ করে' বসে' থাকতে কতো

ভালো লাগ্‌তো। প্রকাশের সে অদম্য পিপাসায় স্নায়ু-তন্ত্রীগুলি ক্ষণে-ক্ষণে ঝঙ্কার দিয়ে উঠতো। তাই লেখার পেছনে অনুভূতির যে গাঢ় একটা পটভূমিকা থাকতো, তাইতেই প্রকাশের উলঙ্গতা হ'তো সহনীয়, সুন্দর। এখন আর সেই পটভূমি রচনা করবার সময় নেই। দীর্ঘ দিনের গভীর ও অনুচ্চারিত প্রেমের পর প্রেয়সীর প্রথম শরীরস্পর্শের মতো তীব্র অনুভূতির শেষে প্রথম অক্ষরপাতের মধ্যে অসহ্য রোমাঞ্চ ছিলো— এখনকার লেখা দিনানুদৈনিক এই বিবাহিত জীবনের মতোই বর্ণহীন, সময়-অতিবাহনের মতোই অচেষ্ট।

কিন্তু না লিখেই বা উপায় কী? কালই তাঁর গল্প চাই —সম্পাদক বলে' দিয়েছেন। কাল দিতে না পারলে এ-মাসে আর গেলো না। এ-মাসে না গেলেই তো কাল আর ডাক্তার ডাকা যাচ্ছে না—খোকা জ্বরে ট্যাঁ ট্যাঁ করছে।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে রান্নাবান্না সেরে আঁচলে ভিজে হাত মুছতে-মুছতে প্রমীলা ঘরে এলো। হাসিমুখে বল্‌লে,—কদ্দূর? অর্দ্ধেক হ'য়ে গেছে? আমাকে পড়ে' শোনাও না। শেষ কী হ'বে আমি ঠিক বলে' দিতে পারবো। শেষটা আমার মনমত হ'লেই জানবে গল্পটা ভালো হ'লো।

বলে' সে টেব্‌লের ওপর ঝুঁকে পড়লো: এ কী? এক লাইনো লেখ নি? কখন তবে শেষ হ'বে? দু'ঘণ্টা ধরে' করছিলে কী তবে এতোক্ষণ? কোন্ প্রেয়সীর ধ্যান করছিলে শুনি?

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম; বল্‌লাম—তাড়াতাড়ি করে' গল্পের আমি আর অপমৃত্যু ঘটাতে পারবো না।

প্রমীলা খেঁকিয়ে উঠ্‌লো: খোকাকে তাই বলে' ডাক্তার দেখাতে হ'বে না নাকি? আজ দশদিন সমানে ওর জ্বর। ওর চেয়ে একটা দু' পাতার গল্প তোমার বেশি হ'লো? ওটা শেষ না করলে টাকা আসবে কোত্থেকে?

বল্‌লাম,—টাকার জন্যে আমি আমার সাহিত্যের সঙ্গে আর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।

—আর সংসারের সঙ্গেই এই বিশ্বাসঘাতকা বা কতোদিন করতে পারবে শুনি?

ঘর ঘেকে বেরিয়ে যাচ্ছি দেখে প্রমীলা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো: শোনো, যা হোক্ করে' দু' পাতা ভরিয়ে দাও। নামেই গল্পটা তোমার চলে' যাবে দেখো। কাল যদি না ডাক্তার আনো, খোকাকে তা'লে আর বাঁচানো যাবে না।

যেতে-যেতে বল্‌লাম,—গল্পের জন্যে লগ্নের প্রতীক্ষা করে' থাক্‌তে হ'বে। আজ নয়।

—আজ নয়,—তবে যেদিন খোকা—প্রমীলার কথাটা শেষ হ'বার আগেই ছাতে চলে' এসেছি। চারদিক ফাঁকা, নিজেকে বিগতবন্ধ, অসম্ভব রকম মুক্ত ও অবারিত মনে হচ্ছে। যেন কোন্ অনপনেয় অপমৃত্যুর লজ্জা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছি। প্রতি নক্ষত্র-স্ফুলিঙ্গ আমার প্রতিভাকে অভিনন্দিত করছে। বহুভাষণের দৈন্যে আমার মানস-লোকের অপরিস্ফুট স্বপ্নকে কৌতুহলী লোকচক্ষুর সামনে কলঙ্কিত করিনি।

সমাপ্ত

এই লেখকের বই :

কবিতা

অমাবস্যা

গল্প

টুটাফুটা

ইতি

অধিবাস

দিগন্ত

উপন্যাস

বেদে

কাকজ্যোৎস্না

বিবাহের চেয়ে বড়ো

আকস্মিক

প্যান্

প্রথম প্রেম

ছিনিমিনি

প্রাচীর ও প্রান্তর

মুখোমুখি

কিশোর-কিশোরীর

আকাশ-প্রদীপ

ডাকাতের হাতে